দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ১৩ এপ্রিল, ২০২৬।।২৯ চৈত্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৮
নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

৭৮ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ২৯ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৩ এপ্রিল - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

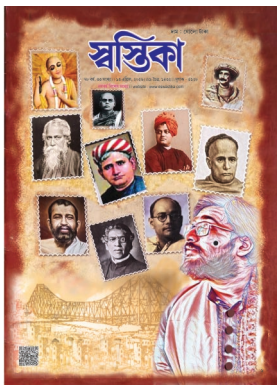

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বীরগাথা আজও সমান প্রাসঙ্গিক □ শ্রীমান চক্রবর্তী □ ৬

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী বিপ্লবীদেরও পীঠস্থান এই বঙ্গভূমি □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ৯

বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ : ছেলেখেলা নয়, লড়াইটা এবার মরা-বাঁচার □ ড. জিষ্ণু বসু □ ১১

বাঙ্গালির আত্মবলোকন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ □ অম্লান কুসুম ঘোষ □ ১৪

বঙ্গের চতুর্থ নবজাগরণ—সহযোগী সমাজ সৃষ্টির পথে বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ ভূমিকা □ জ্যোতির্ময় গোস্বামী □ ১৭

মহারাজা শশাঙ্ক প্রবর্তিত বাংলা নববর্ষ □ প্রতাপ চন্দ্র জোয়াদ্দার □ ২০

বাংলা বারো মাসের নামমাহাত্ম্য □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বঙ্গের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট মহারাজা শশাঙ্ক □ অরুণ কুমার চক্রবর্তী □ ৩৪

বঙ্গের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসকারী বামপন্থীদের চিরতরে নির্মূল করতে হবে □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ৩৫

বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অবদান, শক্তি, স্বদেশ চেতনা ও নবযুগের অগ্রযাত্রা □ ড. মৌমিতা বর □ ৩৯

বঙ্গভূমির গৌরব-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে বাঙ্গালি অস্মিতা □ ডাঃ মধুসূদন পাল □ ৪৩

বঙ্গের প্রথম সার্বভৌম নৃপতি মহারাজা শশাঙ্ক □ অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী □ ৪৫

গল্প কথায় ডাক্তারজী □ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

□ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ □

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

প্রকাশিত হবে ২০ এপ্রিল ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২০ এপ্রিল ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

অক্ষয় তৃতীয়া

সবে বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ হয়ে গেল। এবার অক্ষয় তৃতীয়া। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া ভারতবর্ষীয় সমাজে বিশেষ এক তাৎপর্য বহন করে। এই দিনটিতেও অনেকে পয়লা বৈশাখের মতোই হালখাতার শুভারম্ভ করে থাকেন। এই শুভ দিনটি বঙ্গজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই বিস্তারিত আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নববর্ষের সংকল্প

ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতায় বঙ্গ তথা বাঙ্গালির অতীত গৌরবগাথা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সময় বঙ্গদেশ উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধন, পূর্ববঙ্গে সমতট ও হরিকেল এবং দক্ষিণবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত নামে ছোটো ছোটো জনপদে বিভক্ত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে আনুমানিক দশ সহস্র বৎসরেরও অধিক পুরাতন এই বঙ্গসভ্যতা এক উন্নততর ও সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল। এককালে ইহা গঙ্গাহৃদি রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় তৎকালে গঙ্গাহৃদি একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। যাহার ধনবল ও সৈন্যবলের পরিচয় পাইয়া আলেকজান্ডারের সৈন্যবাহিনী আর পূর্বদিকে অগ্রসর হইবার সাহস পায় নাই। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে, প্রাচীন বঙ্গদেশ কৃষির সহিত বাণিজ্যেও সমৃদ্ধ ছিল। গ্রিক ঐতিহাসিকগণ বঙ্গকে নাবিকদের দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গের বণিকগণ বিশাল বিশাল নৌবহর লইয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্যযাত্রা করিতেন। আনুমানিক পাঁচশত খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বঙ্গরাজ সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ বর্তমান শ্রীলঙ্কায় পৌঁছিয়া সিংহল নামে এক স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতেও বঙ্গদেশের নামোল্লেখ রহিয়াছে। বঙ্গদেশ যে মহারাজা দশরথের কোশল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এহেন উন্নত সভ্যতার ধারক-বাহক বাঙ্গালি জাতিকে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ অর্বাচীন জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ২৩০০ বৎসর পূর্বের মহাস্থানগড় শিলালিপিতে উৎকীর্ণ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালি জাতির প্রস্তরীভূত প্রমাণকে তাহারা অস্বীকার করিবেন কী করিয়া? উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাহারা বাঙ্গালির গৌরবময় ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালির অতীত গৌরব হাজার হাজার বৎসরের সমৃদ্ধ ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং বীরত্বপূর্ণ অপূর্ব এক বিজয়গাথা।

দীর্ঘ বৈদেশিক আক্রমণে এই সমৃদ্ধ বঙ্গ ও বাঙ্গালি জাতির ভাগ্যাকাশে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তাহা হইতে উত্তরণের নিমিত্ত বঙ্গের মনীষীগণ নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন। সেই নবজাগরণ শুধু বঙ্গপ্রদেশকেই নহে, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গালি তাহার শেষ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। দ্বিজাতিতত্ত্বের জিগির তুলিয়া এক সময় সমগ্র বঙ্গই পাকিস্তানের গ্রাসে চলিয়া যাইতেছিল। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় বীরপুরুষের দূরদর্শিতায় হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি হিসাবে বঙ্গদেশের অর্ধাংশের ভারতভুক্তি-পূর্বক 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটির জন্ম হইয়াছে। বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য যে, সেই শ্যামাপ্রসাদকে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়া দশকের পর দশক বাঙ্গালিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। কংগ্রেস কমিউনিস্ট উভয়েই বাঙ্গালিকে হীনম্মন্য করিয়া রাখিয়াছিল। হীনম্মন্য বাঙ্গালি বুঝিতেই পারে নাই যে তাহাদিগের জাতিগত পরিচিতি চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ভাষা চুরি হইয়া গিয়াছে, এমনকী তাহাদের নববর্ষ বঙ্গাব্দও চুরি হইয়া গিয়াছে। জাতির আত্মপরিচয়ের প্রমাণ যে বঙ্গাব্দ তাহাও বহিরাগত বিধর্মীরা চুরি করিয়া নিজেদের বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই অপপ্রচারে সহায়তা করিয়াছে কমিউনিস্টরা। যে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন বঙ্গের স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি মহারাজা শশাঙ্ক করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিয়া মুঘল বাদশা আকবরের নামে তাহারা চালাইয়াছে। অথচ এই বঙ্গাব্দ শব্দের উল্লেখ আকবরের চাইতে কয়েক শত বৎসর পূর্বে বাঁকুড়ায় নির্মিত দুইটি সূর্যমন্দিরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যাহারা আকবরের পক্ষে বলিতেছেন, তাহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, প্রবর্তকের বয়সের চাইতে তাহার প্রবর্তিত অব্দের বয়স অধিক হয় কী করিয়া? আসলে ইহা বাঙ্গালিকে মানসিকভাবে হীন করিয়া রাখিবার একটি কৌশল মাত্র। এই কৌশলেই তাহারা তিন দশকেরও অধিক সময় বাঙ্গালিকে ভ্রান্তিতে রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাহাতে বাঙ্গালির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। বাঙ্গালির সৌভাগ্য যে, সেই ভ্রান্তির কাল কাটিয়াছে। আজি বঙ্গীয় নববর্ষে বাঙ্গালিকে কবিগুরুর ভাষায় 'স্বদেশের দীক্ষা' গ্রহণের সংকল্প লইতে হইবে। তাহাতেই বাঙ্গালির জীবনে-মননে 'স্ব'-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া বাঙ্গালি জাতি স্বমহিমায় বিকশিত হইতে পারিবে।

সুভাষিতম্

অর্থেন ভেষজং লভ্যম্ আরোগ্যং ন কদাচন।
অর্থেন গ্রন্থসম্ভারঃ জ্ঞানং লভ্যং প্রযত্নতঃ।।

অর্থ ঃ অর্থের বিনিময়ে ওষুধপত্র পাওয়া যায় কিন্তু আরোগ্য লাভ নয়। অর্থের দ্বারা গ্রন্থ সম্ভার কেনা যায়, কিন্তু প্রচেষ্টার দ্বারাই জ্ঞান লাভ করা যায় ।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বীরগাথা আজও সমান প্রাসঙ্গিক

শ্রীমান চক্রবর্তী

বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক রতন,
স্বাধীন বঙ্গের শেষ তেজস্বী রাজন;
এখন (ও) ধরণীতলে,
যাহার মহিমা জ্বলে,
যাহার বীরত্ববলে কেঁপেছে যবন।
কল্পনে! এ ধূমঘাট তাঁর নিকেতন।।
.....
প্রতাপ-আদিত্য নাম বিখ্যাত সংসার,
না'ছিল কলিতে দাতা যার সম আর;
বরপুত্র ভবানীর,
প্রিয়তম পৃথিবীর,
বীররসে সুরসিক বীর-অবতার;
স্ববলে শাসিল বঙ্গ উৎকল বেহার।
.....
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৭শে বৈশাখ, ১২৯১,
টাকী-বেওকাটী থেকে প্রকাশিত

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ সমগ্র বঙ্গভূমি মুঘল-পাঠান, মগ, আরাকানরাজ, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের সঙ্গে বঙ্গের বারভূঁইয়াদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এই বারভূঁইয়াদের মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিলেন ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, কন্দর্পনারায়ণ এবং অবশ্যই ভুলুয়া যশোহরের--- বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য। বিদেশি মুঘল-পাঠানদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজ ভূঁইয়াদের সঙ্গে আরাকান রাজ, মগ জলদস্যু ও পশ্চিমি বণিকরূপী ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বঙ্গের স্বাধীন ভূঁইয়াদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছেন, তিনি ছিলেন ভুলুয়া যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য। সমসাময়িক কালে এবং পরবর্তী প্রায় দু'শতাব্দী ব্যাপী পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কথ্য ইতিহাসে ও নানা প্রবাদের ভিত্তিতে লেখা পুঁথিপত্রে মহারাজা প্রতাপাদিত্য কখনো পূজিত হয়ে উল্লেখিত হয়েছেন, কখনো সমালোচিত বা ধিক্কৃত হয়েছেন। আকবরনামা এবং ষোড়শ শতকের থেকে বঙ্গদেশে আগত জেসুইট পাদরিদের বিবরণে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা হিসেবে প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখিত হয়েছে। জেসুইট পাদরিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে ডু জারিক (Du Jarric), স্যামুয়েল পার্শা তাদের লেখায় সাগর দ্বীপের রাজা বা চ্যাণ্ডিকানের রাজা হিসেবে প্রতাপাদিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতকের আবদুল লতিফের ভ্রমণ কাহিনি ও প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মির্জা নাথান আলাউদ্দিন ইস্পাহানি (অপর নাম ঘাইবি) লিখিত 'বাহিরিস্তান-ই- ঘায়বী' থেকেও ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গ, বিহার, অসম, ওড়িশার মুঘলদের যুদ্ধের কথা জানা যায় (A History of Mughal Wars in Assam– Cooch Behar– Bengal– Bihar and Orissa during the reign of Jahangir and Shahjahan– by Mirza Nathan) এবং মানসিংহ আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গিরের আদেশে বঙ্গে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে প্রতাপের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ের সঙ্গেই প্রতাপাদিত্যের সখ্য ছিল। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে প্রতাপাদিত্যের জীবনকাল ও রাজনৈতিক উত্থানের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথাই জানা যায়।

প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব ও আধিপত্যের স্বীকৃতি বঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যে। বর্ধমান রাজ্যের ভুরশুট পরগনার পাণ্ডুয়া নিবাসী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ বা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র রায়ের (১১১৯–১১৬৭) আনুমানিক চল্লিশ বছর বয়সে লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গজ কায়স্থ উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন—" যশোর নগর ধাম / প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ। নাহি মানে পাতসায় , কেহ নাহি আটে তায়,ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ। বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী। ষোড়শ হলকা হাতি , অযুত তুরঙ্গ সাতি, যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।...."

প্রায় দু'শো বছর পর ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে ১৮০১ (শ্রীরামপুর প্রেস) সালে রামরাম বসু তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বীর বাঙ্গালির প্রথম তর্পণ শুরু করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তনী হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮৫৩ সালে উত্তর - পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর জন কলভিনের ও রেভারেন্ড লং সাহেবের অনুরোধে রামরাম বসু কৃত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' গ্রন্থটিকে সমকালীন বঙ্গভাষায় 'মহারাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামে প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ সালে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত, ঘটককারিকা থেকেও প্রতাপাদিত্যের সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানা যায়। এছাড়া বিভারেজ লিখিত বাকেরগঞ্জের ইতিহাস এবং ঊনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের গর্ভমেন্টের গেজেট, স্ট্যাটিসক্যাল অ্যাকাউন্ট (Gazetteer– Statistical Account)-এ দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রচলিত প্রবাদগুলিই স্থান পেয়েছে। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী অনেক তথ্য সংগ্রহ করে 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতেও অনেক ক্ষেত্রে

প্রবাদ ও প্রচলিত গাথাই স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের চরিত্র নিয়ে মূলত সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থ অবলম্বনেই--- উনিশ শতক ও বিংশ শতকেও রচিত হয়েছে উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও জীবনচরিত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে চলতি প্রবাদের বিষয়ই স্থান পেয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রারম্ভেই বঙ্গের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে প্রতাপাদিত্যের নাম সকলের নজরে আনেন সরলাদেবী চৌধুরাণী। এরই প্রভাবে নিখিলনাথ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আমাদের 'প্রতাপাদিত্য'। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'- গ্রন্থটি আচার্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে উৎসর্গ করেন (১৮ই আশ্বিন, ১৩২৯-প্রথম সংস্করণ, বেলফুলিয়া খুলনা থেকে প্রকাশিত)। প্রত্যাপাদিত্য সম্পর্কে বহু অনুসন্ধান চালিয়ে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। যদুনাথ সরকার 'প্রবাসী' পত্রে আবদুল লতিফের ভ্রমণ কাহিনি ও 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়বি' নামক গ্রন্থ থেকে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য জানিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে লিখছেন, ''....বিক্রমাদিত্যের পরিকল্পনায় প্রথম যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমেই তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যের বিলয় হইলেও বঙ্গের সে বীর-পুত্রের রণপ্রতাপের প্রতিষ্ঠা চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিবে। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু তে বঙ্গাদিত্য অস্তমিত হইল। তিনিই বঙ্গের শেষ বীর। প্রতাপের চরিত্র ও ওই উদ্দেশ্য আমরা নানাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সমালোচনা করিয়াছি। ...প্রতাপ রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহী বলিয়া ব্যাখ্যাত হন। কিন্তু অরাজকতার যুগে বিদ্রোহী কাহাকে বলিব? দেশবাসী রাজন্যবর্গ যখন আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান, তাহার বিদ্রোহী, না যাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং যাহারা পররাজ্য স্ববলে অধিকার করিবার জন্য চেষ্টিত, সেই মোগলরা বিদ্রোহী? আত্মরক্ষায় প্রতাপের জীবন আরম্ভ; লবণের মর্যাদা রক্ষার জন্য পাঠানের পক্ষ সমর্থন করা সেই জীবনের পরবর্ত্তী সাধনা। দেশ তখন শতধা বিচ্ছিন্ন; মাৎস্যন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজিত; তজ্জন্য শান্তি বা মতের ঐক্য কোথায়ও ছিল না। প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে, আত্ম-প্রাধান্য বা একাধিপত্য স্থাপিত করিতে না পারিলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। ...তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, প্রজার বলে এবং ভৌমিকগণের রাজকোষের সাহায্য-ফলে দেশের শত্রু মোগলকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিয়া স্বাধীনতা স্থাপন করা চাই। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি পদে পদে অনেক ভুল করিয়াছিলেন। তেমন ভুল অনেকের হয়, সকল দেশের ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষী। ...বসন্তরায়ের হত্যা এই জাতীয় একটি প্রধান ভুল। ...ইহা হইতে জ্ঞাতি-বিরোধ ও আত্মকলহের সৃষ্টি। .... যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই অনুগত দিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহিতা তাঁহাকে দুর্বল করিয়া তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কারণ তিনি যে স্বাধীনতা লাভের নূতন মন্ত্র প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ...দেশকাল ও পাত্র তাঁহার আদর্শের মর্ম না বুঝিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।...''

বাঙ্গালিরই একাংশ আজও সেদিনের ভবানন্দ মজুমদার, রূপরাম বসু, ভবেশ্বর রায়, কচু রায়, মানসিংহের বেশ ধারণ করে সনাতন হিন্দু বাঙ্গালির সর্বশেষ আভাসভূমি 'পশ্চিমবঙ্গ' রাজ্যকে পশ্চিমি ও আরব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে বিকিয়ে দিতে তৎপর।

কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর শিবাজী মহাকাব্যে মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজীর মুখে বলিয়েছেন— 'নহে বহুদিন গত, শুনি বঙ্গদেশে , প্রতাপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর, / তেজস্বী, স্বধর্মনিষ্ঠ; করিলা প্রয়াস , স্থাপিতে স্বাধীন-রাজ্য। বিপুল বিক্রমে / পরাজিল বাদশাহী সেনা বহুবার। বিজিত বিধ্বস্ত কিন্তু হ'ল অবশেষে; রাজ্য-সংস্থাপন হ'ল আকাশ-কুসুম।''

তেজস্বিতা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টাই তাঁকে ইতিহাসে অমর করেছে। তাঁর পতনের কারণ বোঝাতে গিয়ে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন--- ''বলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা, শুন গূঢ়তত্ত্ব তা'র। তেজোবীর্য্যগুণে / প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনতা লাভে; কিন্তু তা'র জাতি, দেশ না ছিল প্রস্তুত; জ্ঞাতিবন্ধু বহু তা'র ছিল প্রতিকূল, তাই হল ব্যর্থ চেষ্টা।....''

প্রচেষ্টার মধ্যেই মানুষের পুরুষকার, তার ফল সর্বদাই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। তিনশো বছর পর বিংশ শতকের শুরুতে অবিভক্ত বঙ্গদেশের সমগ্র জাতিকে সামরিক বল, নির্ভীক আত্মত্যাগ, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে থাকা বাঙ্গালি নারী সরলাদেবী চৌধুরাণী মহারাজা প্রতাপাদিত্য ও তাঁর বীরপুত্র উদয়াদিত্যকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা'-য় তিনি লিখছেন , ''...মণিলাল গাঙ্গুলী বলে একটি ছেলে ছিল। ...তার পরিচালিত একটা সাহিত্য-সমিতি ছিল ভবানীপুরের ছেলেদের। সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসারিত উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রীত্ব করি। ...আমি ইতিস্ততঃ করতে লাগলুম। ...পীড়াপীড়ি করাতে আমি একটু

ভেবে তাকে বললুম— ''আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব--- এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' কর, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। ...সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙ্গালী ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর, আর আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব।

একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে--- প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও-পড় তাঁর জীবনী, তার সার শোনাও সভায়। ...মণিলালের অনুরোধে আমাকে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের একটি উদ্বোধনের দ্বারা সভার 'atmosphere' তৈরি করে দেওয়া হল। মেডেলের ওপর একদিকে খোদাই ছিল- 'দেবাঃ দুর্বলর্ঘাতকাঃ'। ...বিপিন পাল তাঁর Young India-তে টিপ্পনী করলেন- ''As necessity is the mother of invention– Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal !...''

সরলাদেবী লিখছেন— দীনেশ সেন একদিন তাঁর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) দূত হয়ে এসে আমায় বললেন, ''আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর।'' তাঁর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন।.... প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির Hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।'' আমি দীনেশবাবুকে বললুম, ''আপনি তাঁকে বলবেন, আমি তো প্রতাপাদিত্যকে moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি; তাঁর পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে politically great ছিলেন, বাঙ্গলার শিবাজী ছিলেন, মোগল-বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে সিক্কা চালিয়েছিলেন; সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। .... এতে যদি ইতিহাসগত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।'' '.... বাঙ্গালীর বীরপূজা চলতে থাকল। এবার প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসবের আয়োজন করলুম। ....'Bengalee'তে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার আয়োজিত সব অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বেরতে থাকল। উদয়াদিত্যের উৎসবের ঘোষণায় বেঙ্গলি পত্রিকা এইভাবে লিখল— ''সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন 'surprise spring' করছেন— আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি।....''

১৫ আগস্ট, ১৯৭৮ শৈলেশ দে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত অগ্নিযুগ গ্রন্থের প্রথমখণ্ডের (বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর) দ্বিতীয় প্রবন্ধেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা 'B.V.' দলের সক্রিয় কর্মী বিপ্লবী অমলেন্দু ঘোষ 'বীরাঙ্গনা সরলা দেবী' প্রবন্ধেও উপরে বিবৃত ঘটনার উল্লেখ করে লিখছেন, ''....এরপর এল 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'। সরলা দেবীরই পরামর্শে ভবানীপুরস্থ সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী বীর প্রতাপাদিত্যের স্মরণে বাঙালি ছেলেদের একত্র হয়ে শুধু কুস্তি, লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, বক্সিং ইত্যাদির ব্যবস্থা। দেখে সবাই খুশি হলেন। ....শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আহ্বান, বঙ্গ যুবকদের হস্তে হস্তে অস্ত্র ধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গ-ললনার হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণ হইলেন।'' ২৬ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে একটা ব্যায়ামের ক্লাস খুললেন তিনি। ক্রমে ক্রমে এ ক্লাসের খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় এরকম ক্লাব খুলে গেল। সরলাদেবীর ভাষায়— পুলিন দাসও এলেন ঢাকা থেকে 'অনুশীলন সমিতি'র সর্দার হয়ে। সে'দিনের জাতীয়তার মন্ত্র, স্বাদেশিকতা ও স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতাপাদিত্য চরিত্র বাঙ্গালী জাতীয় জীবনে এক নূতন মাত্রা যুক্ত করেছিল।'

আজ প্রায় চারশো বছর পেরিয়ে ইতিহাসের বাঁকাপথে খণ্ডিত ভারত এবং বঙ্গদেশ। ১৯৪৭-এর পূর্ব-পাকিস্তান ও ১৯৭১ বাংলাদেশ স্থাপনা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী বাঙ্গালি জাতির জন্য নিয়ে এসেছিল দীর্ঘ যন্ত্রণা, ক্ষত ও গ্লানির ইতিহাস। ১৯৪৭-এর অনেক আগে ১৯০৫ সাল থেকেই সমগ্র বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদ শুরু হতে থাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় একাংশের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিতে। ১৯৪৭ সাল থেকে বঙ্গদেশের সীমানা সংকুচিত হয়ে প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ ভূমি নিয়ে সনাতন হিন্দু বাঙ্গালি জাতির আবাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খণ্ডিত ভারতের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে। কিন্তু আজ বাঙ্গালি হিন্দুর সেই আবাসভূমির স্বাধীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক সত্তা নতুন করে আক্রান্ত। বাঙ্গালি হিন্দুকে আজকে এই পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে আজ থেকে সেই চারশো বছর আগে সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কথা, যিনি স্বধর্ম ও স্বাদেশিকতার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বিদেশিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। নিজের অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলেও তিনি আপোশ করেনি; আত্মশক্তি ও সংগঠিত শক্তি যে কোনো জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত। বঙ্গেশ্বর মহারাজা সেই পথেই হেঁটেছিলেন। তাঁর বিরোধী শুধুমাত্র বিদেশি ও বিজাতীয়ই শক্তিবর্গই ছিল তাই নয়; দেশীয়দের প্রায় সকলেই তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। সেদিন তাঁর জ্ঞাতিকুল ও স্বদেশবাসী স্বধর্ম ত্যাগ ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ক্ষুদ্র ক্ষমতা ও স্বার্থের লোভে। বিজাতীয় বিদেশির কাছে নিজের মাতৃভূমিকে পরাধীনতা শৃঙ্খলে নিমজ্জিত করে। আজ প্রায় চারশো বছর পরও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গবাসী সেই ব্যাধিতে সমানভাবে আক্রান্ত। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বীরগাথা তাই আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বাঙ্গালিরই একাংশ আজও সেদিনের ভবানন্দ মজুমদার, রূপরাম বসু, ভবেশ্বর রায়, কচু রায়, মানসিংহের বেশ ধারণ করে সনাতন হিন্দু বাঙ্গালির সর্বশেষ আভাসভূমি 'পশ্চিমবঙ্গ' রাজ্যকে পশ্চিমি ও আরব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে বিকিয়ে দিতে তৎপর। □

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী বিপ্লবীদেরও পীঠস্থান

এই বঙ্গভূমি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

কুইজে প্রশ্ন আসল, পরাধীন ভারতে অস্ত্র আইনে দণ্ডিত প্রথম মহিলা কে? সারা ভারতের মুখ ফিরবে বাঙ্গালির দিকে। আঙিনায় মাদুর বিছিয়ে আচার আর সেলাই নয়। ইসলামিক আগ্রাসন এবং ব্রিটিশ অত্যাচারের পর স্ত্রী-শিক্ষার দীপ যেমন জ্বলেছিল বাঙ্গালির হাত ধরেই, ঠিক তেমনই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালি মেয়েরাই সারা ভারতকে দেখাল, শেখাল মেয়েদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। দুকড়িবালাদেবী তাঁর কোলের সন্তানকে রেখে জেলবন্দি হন অস্ত্র আইনে। যখন সারা ভারত মহিলাদের স্বাভাবিকভাবে দিদি-মাসিমা- কাকিমা সম্বোধন করে, তখন সেই বিপ্লবী ছদ্মনাম 'মাসিমা' দুড়কিবালাদেবী বিপ্লবী বিপিন গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রডা কোম্পানির মাউজার পিস্তল, কার্তুজের ৫০টি লুট করা বাক্স নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন। ১৯১৭ সালে ৮ জানুয়ারি বাড়ি তল্লাশির পর তিনি হয়ে উঠলেন অস্ত্র আইনের প্রথম দণ্ডিতা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুক্তি বীরাঙ্গনাও। ভারতের ইতিহাস ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ থেকে রানি দুর্গাবতী, রাণী রাসমণির তেজ ও ব্যক্তিত্ব জেনেছে। কিন্তু জন বিপ্লবে পুরাতন সব বেড়া ভেঙে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে বাঙ্গালি নারীরা যেভাবে সক্রিয় বিপ্লবে, আন্দোলনে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তা ভারতমাতার বন্ধন মুক্তির ঘরে যেন সত্যিই সবাই এক একজন চিত্রাঙ্গদা। এক একজন অগ্নিকন্যা। শিক্ষা-ব্যক্তিত্ব-তেজ-সাহস- তপস্যা এবং সব লোকসংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা যেভাবে অর্ধনারীশ্বর হয়েছিলেন তা ভারত কেন বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে স্থান দখল করবে। দু'শোরও বেশি বীর বাঙ্গালি কন্যাকে ব্রিটিশরা জেলবন্দি করেছিল। আনুমানিক ১৯১৯ এর পর থেকেই ব্রিটিশ দলিলে বাঙ্গালি মেয়েদের নাম ওঠা শুরু। অনেক নাম স্মৃতির অতলে চলে গেছে। যেমন সুধাংশুবালা সরকার। এতটাই 'ডেনজারাস' ছিলেন ব্রিটিশদের চোখে যে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ ও বৃত্তান্ত প্রস্তুত করতে হিমশিম খেয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ। ১৯০৮ এর আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত তিনি। উল বোনে যে হাত সে আবার বোমাও বাঁধে। এও হয়! হয়, এবং তা হইয়ে দেখিয়েছিল বাঙ্গালি ঘরের শিক্ষিত, সাহসী, সচেতন মেয়েরা। বেলা রায়, হাস্যবালা দেবী, লীলাবতী বর্মা সবাই যেন এক একটা অগ্নিশিখা। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেছিলেন, তিনি উপকরণ চান না। অমৃত চান। সেই সত্যকেই চেয়েছিলেন বাঙ্গালি নারী বিপ্লবীরা। সেখানে যে কতটা উপকরণ আছে তা গুনতে যাননি। মজ্জা যাঁদের কখনও দুর্বল হয়নি। তাই সারা ভারত স্বীকার করে লিঙ্গবৈষম্যহীন কর্মযোগ বঙ্গের মাটি থেকেই রূপ লাভ করে।

অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা আত্মবলিদানের ইতিহাসেও বাঙ্গালি কন্যা প্রীতিলতা। কুচিয়ে চুল কেটে পুরুষের ছদ্মরূপে যাঁকে অস্ত্র লুঠ করতে হলো। ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে সফল দায়িত্ব পালন। ঘড়ির কাঁটা সবে ২৪ তারিখ ছুঁল। তিনি আত্মাহুতি দেন। মাস্টারদা সূর্য সেন ভরসা করে পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব প্রীতিলতাকেই দিয়েছিলেন। একজন গভীর বোধের অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপনের শিক্ষক মাস্টারদা বুকভরা বিশ্বাসে বলেন, 'বঙ্গদেশে বীর যুবকের আজ অভাব নাই। বালেশ্বর থেকে জালালাবাদ, কালারপুল পর্যন্ত এদের দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে বীর যুবকের রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গলার ঘরে-ঘরে মায়ের জাতিও যে শক্তির খেলায় মেতেছে, ইতিহাসে সে অধ্যায় আজও অলিখিত রয়ে গেল। মেয়েদের আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হোক এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ জানুক, এদেশে মেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধে পিছিয়ে নেই। 'বাঙ্গলার অদম্য মাটি এক ইতিহাস', প্রচলিত ধারার বাইরে ফর্মূলা প্রমাণ করল। ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রীতিলতা। তাঁর নেতৃত্বে চলেছে একদল পুরুষ বিপ্লবী— শান্তি চক্রবর্তী, কালীকিঙ্কর দে, সুশীল দে, প্রফুল্ল দাস, পান্না সেন, বীরেশ্বর রায়, মহেন্দ্র চৌধুরী। এ তো দৃষ্টান্ত, এ তো প্রথা ভাঙারও বিপ্লব। যে সময় ঘরে-ঘরে মেয়েদের লেখাপড়া করাটাই একটা আকাশছোঁয়া বিষয় ছিল, সেই সময় একটা বয়সে নবীন মেয়ে প্রীতিলতাকেই নেত্রী তথা কমান্ডার হিসেবে গ্রহণ করা —এও এক বিপ্লব প্রণালী। সেদিন যা করেছেন প্রীতিলতা-মাস্টারদা, তা আজকেও আমাদের পালন করার মতো মনের, স্নায়ুর জোর খুব কম অংশেরই রয়েছে। বাঙ্গালি মেয়েরা সরাসরি বিপ্লবে এলেন বলেই বাঙ্গালি আজকেও অহঙ্কারের সঙ্গে বলতে পারে, আমরা সময়কে দিক নির্দেশ দিয়েছি। নবজাগরণ বাঙ্গালির হাতেই ঘটেছিল, সশস্ত্র সংগ্রাম, স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নবজাগরণটাও এসেছে বাঙ্গালি মেয়েদের আদর্শে। প্রীতিলতাকে যত জানব তত যেন জানার আগ্রহ বাড়বে। নিজের হাতের লেখা বিবৃতিতে তিনি বলেন 'আমি বিধিপূর্বক ঘোষণা করিতেছি, যেই প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যাচারীর স্বার্থ সাধনে প্রয়োগকারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমরা মাতৃভূমি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক। আমি সেই রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্যা...।' তারপর সেই নবীন কিন্তু পরিণত মনের তেজি মেয়েটা লিখল 'দেশের মুক্তি সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে

অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না। নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে তাহারা আজ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। নিজ মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যেকোনো দুরূহ বা ভয়াবহ ব্যাপারে ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে তাহারা ইচ্ছুক ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই আজিকার এই অভিযানের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি। আমি ঐকান্তিক ভাবে আশা করি যে, আমার দেশের ভগিনীরা আজ নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন এই আশা লইয়াই আমি আজ এই আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।'

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন ব্যতিক্রমী উদ্দীপ্তপূর্ণ কঠোরবোধের সংকল্পের আর কোনো প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানা নেই। প্রীতিলতা বাঙ্গালির অহঙ্কার, ভারতের চেতনা গঠনের পাঠশালা। অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীতে সশস্ত্র সংগ্রামে বাঙ্গালি বীরাঙ্গনা যে স্বাভিমান নির্দেশ দিয়েছে বাঙ্গালির চেতনার পাল্লা ভারী করেছে দেশের মধ্যে। রণনীতির নবনির্মাণ ঘটেছে। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, সুনীতি চৌধুরী, শান্তি ঘোষ তো কেবলমাত্রই নাম নন, তাঁরা এক একজন জীবন্ত দলিল, প্রমাণ, যেন দুর্জয় দুর্গ। দেশপ্রেমে এঁদের সর্বজয়ী কালী রূপ প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা বিনাশ করছেন সব অশুভ। ইন্দুমতি গোয়েঙ্কা, দুকড়িবালা দেবী, কল্যাণী দাশ, কমলা চ্যাটার্জি, বীণা মজুমদার, প্রভাতনলিনী মিত্র, ইলা সেন, লীলা রায়, লীলাবতী বর্মা, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, ননীবালা দেবী, মাতঙ্গিনী হাজরা, জয়শ্রী— এ তালিকা দীর্ঘ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সব দুর্গার নাম, তথ্য, কর্ম, বিপ্লবযজ্ঞের দলিল পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেন বাসন্তী দেবী। দেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তিক স্থলে যাত্রা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেন স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ রয়েছে মানুষে-মানুষে। সেই অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের তিনি সংগ্রামে সংগঠিত করতে উদ্যত হন। তাঁর নির্মিত নারী কর্মমন্দির হয়ে ওঠে বিপ্লবী তৈরির ঠিকানা। বঙ্গপ্রদেশে সে সময় ব্রাহ্ম সমাজ নারী অধিকার, নারী অগ্রসরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। সরলা দেবী চৌধুরানি, বেলা মিত্র কিংবা কল্যাণী দাশের মতো নেতৃত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্রাহ্মসমাজের মুক্ত জীবনবোধে জারিত। বঙ্গীয় নারী বিপ্লবীর এতটাই তেজ প্রকট হয়, সাহেবরা বাধ্য হয়ে শুধুমাত্র মহিলা বিপ্লবীদের 'ডেনজারাস' ডিগ্রির ভিত্তিতে ব্লু লিস্ট, রেড লিস্টের চল আনে। শাসকের যখন এত ভয়, তখন এর চাইতে বড়ো স্বীকৃতি আর কিছুই হয় না।

ঢাকা শ্রী সঙ্ঘের প্রথম মহিলা বিপ্লবী লীলা নাগ। কলকাতার শান্তিলতা পালিত, বনলতা সেন, রেনুকা রায়, সোমা মুখার্জি, রেণু সেন, সোমকুমারী দেবী, শোভারানি দত্ত, শ্রেয়া গুপ্তরা তাঁদের শাস্ত্রবাক্যে দেশবোধ, সংগ্রাম সংক্রমিত করেন। মেদিনীপুরের পুষ্পবালা জানা, রানি শিরোমণি, সত্যভাবা দাস, ভগবতী জানা, সাবিত্রী দে, নূপুর বালা, মোক্ষদাবালা সামন্ত, মঞ্জুশ্রী মণ্ডল, সুচরিতা প্রামাণিক, পুরীমাধব প্রামাণিক, সরস্বতী বালা জানা, লক্ষ্মীমণি হাজরা, চারুশিলা দেবী যেন বিপ্লবের সুবর্ণরেখা। যাঁরা স্ব-স্ব অঞ্চলে পুরুষদের সঙ্গে সমান্তরাল আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। সুবর্ণরেখার তটের নির্যাস সোনার কণিকা ওঁরা সবাই। হুগলির বরদাময়ী হাইত, সুলতা মিত্র, রাধারানি রায়, জলদবরণী ঘোষ একটু অপরিচিত নাম ঠিকই কিন্তু এঁরা সবাই এক একজন মাতঙ্গিনী। পুরুলিয়ার ভাবিনী মাহাত, কৃত্তিবাস মাহাত ইংরেজদের ত্রাস। বাঁকুড়ার কমলাবালা তন্তুবায়, ননীবালা গুহ, মঞ্জুরানি দেবী আগুনে পোড়া টেরাকোটার মতোই শক্ত। মুর্শিদাবাদের রাহিলা খাতুন, শিউলি গুপ্ত নতুন বিপ্লব সীমা। উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রভাবতী ভাণ্ডারী, সুনীতিবালা দেবী এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বনলতা সেন সবাই শিকল ভাঙার উপন্যাস লিখেছেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। বাঙ্গালির এও এক স্বতন্ত্র ইতিহাস, গর্ব, যেখানে কেবলমাত্র নারীদের নিয়েই দীর্ঘ পুস্তক রচনা করা যায়। নবজাগরণে যে বিপ্লবটাও তার নিজের বোধ, চেতনা, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিল তা এই বীরাঙ্গনাদের দিকে তাকালেই নিশ্চিত হওয়া যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলন বাঙ্গালির দ্বারাই সৃষ্ট। সত্যি বলতে তখন সব বিপ্লবী যুবক তরুণ ছাত্রের ঘরেও আরও একজন নারী বিপ্লবী ছিলেন— তাঁদের মায়েরা। প্রতিটি বিপ্লবীর প্রথম স্ফুলিঙ্গ এসেছিল মায়ের গভীর দেশবোধ থেকে। সেইসব মায়েরা প্রীতিলতার মতো পিস্তল ধরেননি ঠিকই কিন্তু তাঁরা ছিলেন বলেই এমন বীরত্বের গাথা বঙ্গের মাটিতে তৈরি হয়েছে। ইতিহাসে কেউ উপেক্ষিত নন, তখনকার অস্থির পরিস্থিতির জন্য অনেকের তথ্য, দলিল পূর্ণ সংরক্ষণ হয়নি। সেই সব বিপ্লবী বীরাঙ্গনারা ঘুরেও দেখতেন না কতটা রেকর্ড রইল আর কতটা পুলিশ নষ্ট করল। তাঁরা সমষ্টিগতভাবে সংগঠিত বহ্নিশিখা। যাঁরা বিপ্লবী, যাঁরা পরবর্তীতে নারী প্রণীত রাষ্ট্রনীতি রাজনীতিরও পথ প্রদর্শক। যাঁরা ভাবনার চাকা ঘুরিয়েছেন, যাঁরা অচলায়তনেও বোমা নিক্ষেপ করেছেন, ধরা পড়েছেন প্রজন্মের অনুপ্রেরণায়। আমরা গর্বিত, ১৯২৪ সালে বঙ্গের গণিকারাও সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন। অনুশীলন সমিতির যুবকদের সাহায্য করার জন্য ১৯০৭ সালে কলকাতার গণিকারা এগিয়ে এসেছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন বিডন স্কোয়ারে সভা করছেন, আচমকাই পুলিশ লাঠি চার্জ করলে গণিকারাই পুলিশের উপর ইট বৃষ্টি করেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটিতে ত্রাণের টাকা এসেছে সোনাগাছি থেকে। স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৪ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে গণিকাদের সঙ্গে রাখেন। নিবন্ধে উল্লিখিত জ্যোতির্ময়ী দেবী মেদিনীপুর ম্যাজিস্ট্রেটের চোখে চোখ রেখে ফুঁসে বলেছিলেন— আমরা বুকের রক্ত দেব। চিৎপুরের গণিকা বিমলা দেবী এক অনমনীয় চরিত্র। পেশা ত্যাগ করে তিনি দেশব্রতী হন। ব্রিটিশ বিরোধী জনসভায় ঘোড়া পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ করেন। রণচণ্ডী বিমলাকে দেখে পুলিশ পিছু হটেছিল চিৎপুরে। আমাদের বাঙ্গালি মেয়েদের আন্দোলনের ওজন এখনও আমরা করতে পারছি না। তাঁদের বাইরের পট আর মনের জোর এক নয়। নারী সংগঠন, বিপ্লবী নারী মন্ত্রের পীঠস্থান আমাদের বঙ্গভূমি। □

বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ : ছেলেখেলা নয় লড়াইটা এবার বাঁচা-মরার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, 'হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।'— এই ধর্মযুদ্ধে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে, নতুবা আবার কোনো বীরপ্রসবিনী মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে আবার সেই হিন্দু লড়াই করবে।

ডঃ জিষ্ণু বসু

তোমরা বলেছিলে 'খেলা হবে'। ২০২১ সালে নির্বাচনের পরে আমরা দেখলাম ৬২ জন বাঙ্গালি হিন্দুর তরতাজা প্রাণ চলে গেল। নীতিকথার সেই কাহিনি মনে আসছে। ছেলেরা খোলামকুচি নিয়ে জলে খেলছিল। সেই পুকুরে ব্যাঙেদের ভরা সংসার। প্রতিটা ছোঁড়া ইঁটের টুকরো তাদের পরিবারের সদস্যদের ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। তখন ব্যাঙেদের সর্দার উঠে ছেলেখেলা বন্ধ করতে বলল। বলল, তোমাদের জন্য যা খেলা আমাদের জন্য তা মৃত্যু আর জীবনের প্রশ্ন।

আজ আবার ওরা খেলতে এসেছে। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সন্দেশখালির রাজবাড়ি,'রাজস্ব'-এর সিংহভাগ টাকা মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় করা প্রমাণ করছে যে বাঙ্গালির কাছে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্বটাই আজ প্রশ্নের মুখে।

আমি বাংলাদেশের থেকে এক বছরের ছোটো। আমার জন্ম ১৯৭২ সালে। 'আমার ভাই এর রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?' আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটি শৈশবকাল থেকে আমি যত মন্ত্র উচ্চারণ করে আসছি তার চেয়েও বেশি পবিত্র ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আজ সারা বিশ্ব খোদ বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্যকে ধ্বংস হতে দেখছে।

আজ যখন একজন হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়, একজন দীপু দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, একজন চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, সাহাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের কাছারিবাড়ি ভাঙচুর করা হয়, ঢাকায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়, তখনই আমরা শুনতে পাই আমাদের শৈশবের স্বপ্নের বাংলাদেশ নামক স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

এটি কেবলমাত্র হিন্দু বাঙ্গালির জাতিগতভাবে নির্মূল হওয়াই নয়, এটি গত সহস্রাব্দে তৈরি হওয়া একটি সম্পূর্ণ সভ্যতার বিনাশ।

বাংলাদেশের এই প্রতি দিনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের শেষলগ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কারণ 'পশ্চিমবঙ্গ' বাঙ্গালি হিন্দু হোমল্যান্ড হিসেবে অর্জিত হয়েছিল।

যখন সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা প্রায় নিশ্চিত, তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, স্যার যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মতো মনীষীরা বাঙ্গালি হিন্দুদের বাসযোগ্য ভূমির জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন, বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ডোমিনিয়ন অব ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গকে শেষ করা আসলে উপমহাদেশের মানচিত্র থেকে বাঙ্গালি হিন্দুদের শেষ আশ্রয়স্থলকে নিশ্চিহ্ন করা। কী ছিল এই বঙ্গ? — 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার দেশ'।

গঙ্গারিডি ছিল বঙ্গের একটি শক্তিশালী প্রাচীন রাজ্য, যে রাজশক্তির ভয়ে ৩২৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণের পরিকল্পনাকে পরিবর্তন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গ সারা বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদনের (জিডিপি) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখত। অতীশ দীপঙ্করের মতো পণ্ডিতেরা তাঁদের প্রজ্ঞা দিয়ে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছিলেন। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ আক্রমণের আগে বাঙ্গালি মসলিন বোনা শিখেছিল। বঙ্গের দুই ধারওয়ালা ইস্পাতের তলোয়ার জগদ্‌বিখ্যাত ছিল। কাঠের জাহাজ নিয়ে ইংল্যান্ডের সাহেবরা বিশ্ববিজয় শুরু করার আগে বাঙ্গালি নিখুঁত নকশার অর্ণবপোত তৈরি করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে উন্নতির জন্য তখন স্থিতাবস্থা ছিল। স্থিতিশীলতা সমৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু অচলাবস্থাকে স্থিতিশীলতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলাটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। যে নদী স্রোত হারিয়ে ফেলে, সেখানেই মশা এবং অন্যান্য পোকামাকড় জন্মায়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উভয় দিকেই জেহাদি শক্তি সমানভাবে সক্রিয়। সহজ

ফঃ ২

ভোটব্যাংকের লোভে পূর্বতন ও বর্তমান শাসকদল পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অনুপ্রবেশকে বাড়তে সাহায্য করছে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ অবশ্য উল্লেখ্য। ২৩ জুলাই, ১৯৯৮ সালে তদানীন্তন বামফ্রন্ট বিধায়কের নেতৃত্বে প্রায় ৩০০০ জনের উন্মত্ত জনতা উলুবেড়িয়া স্টেশনে হাওড়াগামী কুরলা এক্সপ্রেসকে থামিয়ে দেয়। ট্রেনটি মুম্বাই থেকে আসছিল। মহারাষ্ট্র পুলিশের থেকে তারা ৩৪ জন বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে ছিনিয়ে নেয়। আর একটি ঘটনা। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শাকিল আহমেদ ১৯৯০-এর দশকে ভারতে প্রবেশ করে। স্থানীয় বামফ্রন্ট নেতারা নদীয়া জেলার করিমপুর থেকে ভোটার কার্ড পেতে তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর শত শত শাকিল আহমেদ স্লিপার সেল তৈরির কাজে লেগে যায়।

২০১১ সালে নবগঠিত সরকার ১১, ৫০০ খারিজি মাদ্রাসাকে পরিচালনার অনুমতি দেয়। বর্ধমান মঙ্গলকোটের শিমুলিয়া মাদ্রাসা তাদের মধ্যে অন্যতম। শাকিল এসব মাদ্রাসা থেকে কাওসরের মতো দরিদ্র ভারতীয় মুসলমান মেয়েদের সংগ্রহ করতে থাকে। তারাই ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আই ই ডি)-এর অ্যাসেম্বলি ইউনিট শুরু করে। ২০১৪ সালে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পরে পুরো ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের গরিব রাজ্যগুলির একটি। স্বাধীনতার পরেও নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ একটি ধনী, শিল্পগতভাবে উন্নত এবং কৃষিপ্রধান রাজ্য ছিল। হাওড়াকে প্রাচ্যের শেফার্ড বলা হতো। বাম আমলে উগ্র আর হিংস্র ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্য আর সর্বগ্রাসী রাজ্য সরকারের অত্যাচারে ধীরে ধীরে ভারী শিল্প এরাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বাধিক সংখ্যক হস্তশিল্পের ক্লাস্টার আজও টিকে আছে এই পশ্চিমবঙ্গে। সারা ভারতে এই ক্লাস্টার বা গুচ্ছশিল্পের মোট সংখ্যা ৬৪০০ টির মতো।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার ছিল এই রাজ্যে। বারুইপুরের সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার বা হাওড়ার বড়গাছিয়ায় ননফেরাস মেটাল কম্পোনেন্ট ক্লাস্টারের মতো অসংখ্য গুচ্ছশিল্প ছিল পশ্চিমবঙ্গে। বর্তমান দান খয়রাতি,ভাতা রাজনীতির জন্য প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা শিল্প ক্লাস্টারে দক্ষ শ্রমিকের অভাব বাড়ছে কারণ যুবকেরা নেতার দেওয়া মদ আর বাইকের পেট্রোলের দাম পেলেই সিন্ডিকেটের জন্য মস্তানি করছে। কষ্ট করে সাতপুরুষের দক্ষতা বা স্কিল রপ্ত করছে না। সিঙ্গুরে প্রস্তাবিত গাড়ির কারখানা ছিল শেষ ভরসা। অবৈজ্ঞানিক জমি অধিগ্রহণ নীতি এবং টোটালিটারিয়ান রাজনৈতিক গোঁড়ামির কারণে প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়েছিল।

কালচারাল মার্কসবাদীরা এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। সরকার বদল হলো। কালচারাল মার্কসিজমের ধারক বাহকরা মুখে বলেন যে, তারা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই নীতিহীন রাজনৈতিক দলের কল্যাণে তারা সংসদের উভয় কক্ষে পৌঁছে গেলেন। কেউ কেউ মর্যাদাপূর্ণ কমিটির সভাপতি পদে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু গত ১৪ বছরে সিঙ্গুরের মানুষ শিল্পও পাননি আবার উর্বর জমিও ফেরত পাননি।

পঞ্চায়েতের টাকা চুরি করা ছাড়া গ্রামে আয়ের কোনও পথ নেই, সারা রাজ্যে কোনও চাকরি নেই। বহু জেলায় গ্রামের পর গ্রামে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ছয়-সাত মাস রাজ্যের বাইরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাটাতে বাধ্য হয়।

সন্দেশখালি পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বহু গ্রামে এই পুরুষ বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে জেহাদি সমাজবিরোধীরা বা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা মহিলাদের উপর যৌন শোষণ চালাচ্ছে।

মিডিয়ার একটি বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গের কালচারাল মার্কসবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা সক্রিয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করার কাজে জড়িত। বাঙ্গালির প্রতি তাঁদের এই জাতক্রোধের মূল কারণ

বাঙ্গালি সংস্কৃতির ভিত্তি। পঞ্জিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবটাই ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের পরম্পরাগত উত্তরাধিকার। সূর্য সিদ্ধান্ত ছাড়া বাংলা পঞ্জিকা হবে না, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর আধুনিক ভাষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ এই সমগ্র বাঙ্গালি প্রজ্ঞা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের 'ক্রিটিকাল থিয়োরির'সামনে অপ্রতিরোধ্য চ্যালেঞ্জ।

তাই বাংলাদেশে তথাকথিত জুলাই বিদ্রোহের সময় কলকাতা ভিত্তিক প্রধান ধারার মিডিয়ার বর্ণনায় এটি প্রতিফলিত হয়েছিল। একটি নিপাট জেহাদি জনতার আন্দোলনকে কলকাতার কাগজগুলি ধারাবাহিকভাবে সমর্থন করে গেছে।

পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙ্গালি হিন্দুরা দুই দুইটি দেশকে স্বাধীন করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,বিপিনচন্দ্র পাল, পুলিনবিহারী দাস, মাস্টারদা সূর্য সেনের নাম না করলে অপূর্ণ থাকবে, তেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাঠ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম থেকে শুরু হওয়া উচিত। অথচ এই মানুষগুলির ওপর দিনের পর দিন নিদারুণ অত্যাচার করা হয়েছে। বাড়ির মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়েছে, শিশু থেকে বৃদ্ধ নির্বিচারে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সম্পত্তি লুঠ করে তাঁদের একবস্ত্রে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম হতভাগ্য হিন্দুরা সিএএ-এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে পারতেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ আর রাজনীতিবিদদের এঁটোকাঁটা খাওয়া তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা 'কা-কা, ছি-ছি' করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। সম্পূর্ণ মানবিক একটি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এইসব পোষা বুদ্ধিজীবীরা 'আমরা অন্য কোথাও যাবো না' বলে নাটক করেছেন। প্রতিদানে দেওচা-পাঁচামি কোলব্লকের লাভজনক পদ পেয়েছেন। এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকের পরিবারের বাঙ্গালি উত্তরসূরিরা হয়তো লজ্জায় পরিচয় দেবেন না। কারণ কলকাতার হোসেন সইদ সোহরাওয়ার্দি বা নোয়াখালির গোলাম সারোয়ারের মতো বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য এঁরা সমানভাবে দায়ী।

কবি বলছেন উনি অসুস্থ, ওরা ওষুধের দাম দেয় বলে ওনাকে ধরনা মঞ্চে যেতে হয়। যে বাঙ্গালি কবি জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেই মাটিতে এই অবস্থা? কবি, আপনি টাকা ফিরিয়ে দিন। আপনার চিকিৎসার সব দায়িত্ব বাঙ্গালির। কথা দিচ্ছি, আপনাকে কোনো দিন কোনো ধরনামঞ্চে যেতে হবে না। জগন্মাতা কালীর শপথ নিয়ে বলছি!

আজ আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। আজ না সচেতন হলে আমাদের আবার উদ্বাস্তু হতে হবে। সারা বছর যে বাঙ্গালি এত মতামত দেয় তার যত না দাম তার থেকে অনেক বেশি দাম ভোটের দিনে তার মতামত। যাঁরা ভয় দেখাচ্ছেন, তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। যিনি রাজ্যের রক্ষক তিনিই বলছেন, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে একটি সম্প্রদায় মুহূর্তে বাঙ্গালি হিন্দুকে শেষ করে দেবে। প্রশ্ন হলো, এটা কি তাঁকে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ বলেছে?

যদি গোয়েন্দা বিভাগ এমন কিছু বলে, তবে এক্ষুনি দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে কেন জানানো হয়নি। যদি জেহাদি কোনো দুর্বৃত্ত এতটা শক্তিশালী হয়ে গিয়ে থাকে তবে পুলিশের এক্ষুনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদি পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে, আধা সামরিক বাহিনী বা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকা উচিত। যেমন বাদুড়িয়া দাঙ্গার সময় ডাকা হয়েছিল।

এর পরে না হলে দেশের সামরিক বাহিনী আছে। কেউ চাইলেই আমাদের শেষ করে দেবে কীভাবে? এর সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর চাওয়া উচিত। ভারতীয় গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আস্থা না থাকলেই কেবল এমন কথা বলা যায়।

হিন্দুদের ভয় দেখানোর চেষ্টা যদি করা হয় তবে ভুল বুঝেছেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিন্দু ক্রমাগত লড়াই করছে। আমরা জানি অত্যাচারী, জেহাদিদের দয়ায় আমরা বেঁচে নেই। যে জল্লাদ নিজের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্তে শেষ করে দেবে, তার পাশের বাড়ির মা বোনের ইজ্জত নিতে পারে বা রাজ্যের মানুষের সম্পত্তি লুঠ করবে, তার পায়ে লুটোপুটি খেলে কি আমরা পরিত্রাণ পাবো? বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু তার উল্টোটাই বলে। যত নীচু হয়ে থাকবে হিন্দুরা, অত্যাচার তত বাড়বে।

জেহাদিদের কাছে হিন্দু নামধারী মানেই বধ্য। তাই তারা এতকাল যাদের হয়ে নিরীহ বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশ করেছে, সেই প্রভুদের ঘরই দখল করে নেবে। কোনো মুখার্জি ব্যানার্জির মেয়ে বা বউ পছন্দ হলে তাকে রেখে দিয়ে বাড়ির সবাইকে মেরে তাড়িয়ে দেবে।

রাজ্য সরকার হিন্দুদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে কতটা সক্রিয় হয়েছে? যখন ধুলাগড়ে জেদাদি আক্রমণ হয়েছিল এই সরকারের পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। যে নূপুর শর্মার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ হিন্দুর দূর দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই, সেই ঘটনায় অঙ্কুরহাটির মানুষকে মেরে পিটে জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গতবছর মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে নিরপরাধ গরিব হরগোবিন্দ দাস আর চন্দন দাসকে হত্যা করেছে জেহাদিরা। হ্যাঁ,আপনারা থাকার সময়ই এই অত্যাচার হয়েছে। আপনার সরকার এই অত্যাচার হতে দিয়েছে।

যেদিন বামফ্রন্ট সরকার কলকাতার সহ-নগর পাল (এসিপি, বন্দর)- কে দিবালোকে নির্মম হত্যাকাণ্ডের নায়কদের বেকসুর ছেড়ে দিল, সেদিন জেহাদি মোল্লাবাদের বীজ পোঁতা হয়েছিল। বর্তমান সরকার সেই চারাগাছে সার জল দিয়ে সেই বিষবৃক্ষ মহীরুহে পরিণত করেছে।

উলটো উদাহরণ উত্তরপ্রদেশে। আতিক আহমেদের মতো ভয়াল ভয়ঙ্কর অপরাধীও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের এইরকম এক মিনিটে 'শেষ করে দেওয়া' বহু মাতব্বর ভয়ে এসে নিজে থেকে জেলে ঢুকে গিয়েছিল। তাই আইনের শাসন বড়ো কথা। এরাজ্য অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে।

আর ইতিহাস বলে যেসব বিশ্বাসঘাতক হিন্দু সমাজকে ঠকিয়ে জেহাদিদের সাহায্য নিয়েছে, জেহাদিদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেলে তাদেরকেই মেরে-ধরে তাড়িয়ে দেবে। তাই যারা এরাজ্যে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে পাপের রাজপ্রাসাদ বানাচ্ছেন, গোপাচার, কয়লাচুরির অর্থে সোনার বিস্কুট তৈরি করছেন, কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে সোনা নিয়ে আসছেন, তারা ওই পাপের সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন তো? কারণ জেহাদিদের কাছে হিন্দু নামধারী মানেই বধ্য। তাই তারা এতকাল যাদের হয়ে নিরীহ বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বনাশ করেছে, সেই প্রভুদের ঘরই দখল করে নেবে। কোনো মুখার্জি ব্যানার্জির মেয়ে বা বউ পছন্দ হলে তাকে রেখে দিয়ে বাড়ির সবাইকে মেরে তাড়িয়ে দেবে। যদি ভয় করতে হয় তো ওই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা নেত্রীরা ভয় করবে।

যে হিন্দুরা লড়াই করছেন তাঁরা তো অমৃতের পুত্র-কন্যা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, 'হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।' এই ধর্মযুদ্ধে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে, নতুবা কোনো বীরপ্রসবিনী মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে আবার সেই হিন্দু লড়াই করবে। কতশত বীরাঙ্গনা 'জয় হর' বলে লড়াই করে শেষ মুহূর্তে জওহর ব্রত গ্রহণ করে জীবন বলিদান করেছেন। রানি পদ্মিনী থেকে আজ পর্যন্ত লড়াই সমানে চলছে।

তাই ওরা যত বেশি ভয় দেখাবে, আমরা আমাদের মাংসপেশি তত শক্ত করে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গগনভেদি হুঙ্কার দেব— 'ভারতমাতা কী জয়'। □

বাঙ্গালির আত্মবলোকন
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

এই যুগসন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, চয়ন করতে হবে আগামীর সঠিক কাণ্ডারি। একমাত্র তবেই পশ্চিমবঙ্গ আবার বেঁচে উঠবে।

অম্লান কুসুম ঘোষ

অনাদিকাল থেকে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে জ্ঞানালোক প্রদান করে চলা বঙ্গভূমি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির চক্রান্তে দ্বিখণ্ডিত হলো । একটি অংশ চলে গেল পাকিস্তানের করাল গ্রাসে, অপর অংশটি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৎপরতায় রক্ষা পেল ভারতের মধ্যে বাঙ্গালি হিন্দুর হোম ল্যান্ড হিসেবে । একদিকে যখন গোটা দেশের স্বাধীনতা সূর্য উদিত হচ্ছে তখনই বাঙ্গালির ভাগ্যে নেমে এসেছিল দেশভাগের যন্ত্রণা। সেই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির পথ চলা শুরু । আজ সেই পথ চলার ৭৯ বছর অতিক্রম হবার পরে বাঙ্গালির নববর্ষের প্রাক্কালে একটু আত্মবলোকন করে দেখা যাক।

স্বাধীনতার পর প্রথম দু'দশক পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল ভারতের বাকি রাজ্যগুলির তুলনায় ভালো; ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের তখনও প্রত্যক্ষ করেনি। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শাসকবর্গের দক্ষতায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, বাকি ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার যখন স্বাধীনতার পর প্রথম দু'দশকে ঘটেছিল মাত্র ৩ শতাংশ হারে তখন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশের কিছু বেশি। শিল্পক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কিন্তু সেরকম কোনও সদর্থক প্রভাব ফেলেনি । এর কারণ অবশ্য অর্থনীতি-জগতোদ্ভূত নয় বরং রাজনীতি জগতেই আছে এর উত্তর। স্বাধীনতা আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপের মতো আসা দেশভাগ পশ্চিমবঙ্গকেই আঘাত করেছিল সবচেয়ে বেশি। দেশভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ছিন্নমূল মানুষের ভিড় এরাজ্যের অর্থনীতির চাহিদা-জোগান ভারসাম্যে আঘাত করেছিল। ১৯৪৭ সালের ১ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যার পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর প্রথম একদশকে উদ্বাস্তু এসেছিল প্রায় ৮০ লক্ষ । এই বাড়তি ভার পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিল্পবৃদ্ধিজনিত সুফলকে শুষে নিয়েছিল ব্লটিং কাগজের মতো। তবে পাশাপাশি একথাও বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিল্পবৃদ্ধি হয়তো উদ্বাস্তু সমস্যায় দীর্ণ পশ্চিমবঙ্গকে অর্থনৈতিক ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। অর্থনৈতিক উন্নতি না ঘটলেও দেশভাগের আঘাতকে সামলে পশ্চিমবঙ্গ নিজ অবস্থানে অটুট থাকতে পেরেছিল তৎকালীন শিল্পবৃদ্ধির জন্যই।

শিল্পক্ষেত্রে দেশভাগজনিত আঘাতকে সামলে উঠতে পারলেও কৃষিক্ষেত্রে পারেনি। দেশভাগজনিত কারণে স্বল্প জমি , উদ্বাস্তুজনিত কারণে প্রচুর জনসংখ্যা ফলস্বরূপ মাত্রাতিরিক্ত জনঘনত্ব অর্থাৎ বাড়তি চাহিদা এবং কম জোগান। এই জোড়া ফলার আক্রমণ সামলাতে পারেনি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র। তাই অনাদিকাল থেকে সুজলা সুফলা এই প্রদেশে তখন দেখা গেছিল খাদ্য ঘাটতি । এই খাদ্য ঘাটতি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেনি, অর্থনীতির সীমানা ছাড়িয়ে এই খাদ্যাভাবের যুগান্তকারী প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন রাজ্যের সাহিত্য , চলচ্চিত্র, এমনকী রাজনীতিতেও ।

এই সময়ের একেবারে শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত দেশের শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । তাঁর উদ্যোগে এই সময় পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল এশিয়ার প্রথম রেলইঞ্জিন কারখানা চিত্তরঞ্জন-সহ একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভূতপূর্ব উন্নতি তিনি সাধন করেছিলেন উপাচার্য হিসেবে এবং পরবর্তীকালে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকার সময়ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নেহরুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেও তাঁর স্থাপিত শিল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে জলে সিঞ্চন করেছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিল এই শিল্পগুলি। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রও দীর্ঘদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল গোটা দেশের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে। এই সময়কালে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ব্যাপারে

তাঁরা উভয়েই শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন। প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্বকাল মাত্র কয়েক মাস হলেও বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকাল ছিল দীর্ঘ ১৪ বছরেরও বেশি। শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগের পরেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের চাকাকে সচল রেখেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নতিকেও তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই দেখা যায় ১৯৬২ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি গোটা ভারতের জিডিপির ২৫ শতাংশের সমতুল্য ছিল এবং সে সময় শিক্ষাক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের এক নম্বরই ছিল।

বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র অর্থনৈতিক উন্নতির শীর্ষ শিখরে অবস্থান করছিল তখন। পরবর্তী পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্প জগৎ উন্নতির নতুন কোনো শিখর স্পর্শ না করলেও পূর্বার্জিত এই শিখরেই বিচরণ করেছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রের এই উন্নতি কিন্তু অবাধ ছিল না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে। মাশুল সমীকরণ-সহ বহু কেন্দ্রীয় নীতি এনেছিল নেহরু সরকার যা ছিল পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পরিপন্থী। এছাড়াও ঘরশত্রু হিসেবে বামপন্থীরা তো ছিলই। দেশভাগজনিত কারণে সৃষ্ট খাদ্যসংকটকে হাতিয়ার করে কথায়-কথায় ট্রাম-বাস পুড়িয়ে, ধর্মঘট ডেকে, রাস্তায় গুন্ডামো করে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিকে তারা স্তব্ধ করতে চেয়েছিল তখন থেকেই। তবে বিধান রায় তাদের দমন করেছিলেন কঠোর হাতে। কমিউনিস্টরা যেমন কুকুর, বিধান রায় তাদের তেমন মুগুর দিয়েই জব্দ করেছিলেন। বিধান রায় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তীব্র দমননীতি চালিয়ে তাদের জনজীবন থেকে প্রায় মুছেই ফেলেছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু জোর করে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাদের রক্ষা করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংসের মুষলটিকে ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

এভাবেই কাটলো প্রথম দু'দশক। ইতিমধ্যে হাকিম বদলালো। দু'-এক হাত ঘুরে প্রধানমন্ত্রী হলেন নেহরুতনয়া ইন্দিরা। হাকিম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমও কিছুটা বদলালো। এবার শুরু হলো ব্যক্তিগত বিনিয়োগে চলা সংস্থাগুলির সরকারীকরণ। বিপুল অর্থ ক্ষতিপূরণ পেয়ে নিজেদের ধুঁকতে থাকা সংস্থাগুলিকে সরকারের হাতে অর্পণ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মালিকপক্ষ। জনগণের করের টাকার অপচয় করে সেই সব ডুবন্ত সংস্থাগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করে তৎকালীন শাসকদল ভোট-বৈতরণী পেরলো আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলো এক নতুন শ্রেণীর। ট্রেড ইউনিয়ন লিডার নামক সেই নতুন শ্রেণী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীসমূহের ওপর ছড়ি ঘোরানোর পরিস্থিতিপ্রদত্ত অধিকারের অসদ্ব্যবহার করে ঢুকে পড়লো দুর্নীতির বৃত্তে। দু'দশক ধরে জাতীয় অর্থনীতিতে অবস্থিত রাজনীতিবিদ-আমলা-ব্যবসায়ী দুষ্ট-ত্রয়ীর বদলে রাজনীতিবিদ-আমলা-ব্যবসায়ী-ট্রেড ইউনিয়ন লিডার এই দুষ্ট-চতুষ্টয়ে পরিণত হলো।

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই সময়টি ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। সারা দেশের মতো এই সময় পশ্চিমবঙ্গেও হাকিম বদলানোর পালা চলছিল, তবে পশ্চিমবঙ্গে হাকিম ও হুকুম দুই'ই বদলেছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং ঘন ঘন। বলা চলে নতুন নতুন হাকিম আর হুকুমের পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গ। বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তখন কুশীলব পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছে। এই ঘন ঘন পরিবর্তনের সুযোগে উপরোক্ত দুষ্ট-চতুষ্টয় পশ্চিমবঙ্গে জাকিয়ে বসেছিল, সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই এই দুষ্ট-চতুষ্টয়ের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

স্বাধীনতার পর প্রথম দু'দশকে পশ্চিমবঙ্গ যদি দুর্নীতি বিরোধিতার নিরিখে সারা ভারতের চেয়ে এগিয়ে থাকে তাহলে এই কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গই ছিল দুর্নীতিতে সবচেয়ে এগিয়ে। ক্ষুদ্র দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ তখন রাজ্যের স্বার্থের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল। এই কালখণ্ডেই পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে সুশিক্ষিত, মেধাবী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর অধিকারীও সৎ নেতাদের বদলে অর্ধশিক্ষিত, মস্তান পরিবৃত ও অসৎ নেতাদের ক্ষমতার অলিন্দে আনাগোনা প্রত্যক্ষ করলো। স্বাধীনতার পরের প্রথম দু'দশকের খাদ্য ঘাটতি জনিত জনক্ষোভ হয়তো এই 'পালাবদলের পালা' রূপায়ণে কিছুটা হলেও নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল। অধিক উৎপাদন (যা জোগান বাড়িয়ে বাজারে সংশ্লিষ্ট জিনিষের দাম কমিয়ে মালিকের মুনাফা কমায়) রোধে মালিকের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায় ধর্মঘট ডাকতে শুরু করলো শ্রমিক নেতারা। কোথাও কোথাও এই ধর্মঘট মালিকের কারখানা বন্ধের কাজে সহায়ক হবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী হতে হতে চিরস্থায়ী হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু শিল্প ও বর্ধিষ্ণু শিল্পপতি এবং ক্ষয়িষ্ণু শ্রমিক ও বর্ধিষ্ণু শ্রমিক নেতার জাদুঘরে পরিণত হলো। শিল্পের সঙ্গে শিল্পপতির এবং শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিক নেতার এই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে ঠেলে দিল পঙ্গুত্বের দিকে। এভাবেই কেটে গেল একটি দশক। বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে 'পালাবদলের পালা' সম্পূর্ণ হলো এবং পোহালে শর্বরী দেখা গেল রাজদণ্ড পাকাপাকি ভাবে হস্তগত করেছে দুষ্ট-চতুষ্টয়। এর পর হাকিম আর হুকুম কোনওটিই বদলায়নি দীর্ঘদিন। অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

এই সময়কালে ঘটেছিল কয়েকটি ঘটনা। প্রথমত, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কলকাঠিতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কংগ্রেস দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বাংলা কংগ্রেস নামে একটি অংশ অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বেরিয়ে যায়। ফলে '৬৭-র নির্বাচনে বামপন্থীরা কিছুটা সাফল্য লাভ করে এবং অজয় মুখার্জির সঙ্গে জোট বেঁধে যুক্তফ্রন্ট সরকার হিসেবে ক্ষমতায় চলে আসে। এরই ফল হয় ভয়াবহ, ক্ষমতার ছিটেফোঁটা আস্বাদন করেই ভয়ঙ্কর

বামপন্থীরা তাণ্ডব শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে সাধারণ মানুষের মধ্যে, প্রশাসন বিপর্যস্ত হয় এবং নিরাপত্তার অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলি পাততাড়ি গোটাতে শুরু করে। এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় বামপন্থীদেরই একটা অংশ মাওবাদীদের তাণ্ডব, প্রশাসন আরও বিপর্যস্ত হয়। শিল্প বন্ধ হওয়ার হার আরও বাড়ে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বামপন্থীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে। ফলে বিপর্যস্ত হয় শিক্ষা ব্যবস্থা । মেধাবী ছাত্র ও শিক্ষকরা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে শুরু করেন এবং শিল্পের জন্য দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দিতে শুরু করে । ব্যক্তি হিসেবে অজয় মুখার্জি অত্যন্ত ভালো লোক হলেও তারই মন্ত্রীসভার এই বামপন্থী নরাধমদের তাণ্ডব তিনি বন্ধ করতে পারেননি এবং নিজেই নিজের মন্ত্রীসভার পতনও ঘটিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মোটামুটি ওই সময়েই ইতি ঘটে যায় কিন্তু এর মধ্যে বোতলমুক্ত দৈত্যের মতে রক্তোন্মাদ বামেরা তখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তাণ্ডব শুরু করে, সাঁইবাড়ির মতো ঘটনাও ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। সে দৈত্য আর কখনোই বোতলবন্দি হয়নি।

আরেকটি ঘটনা এই সময় পশ্চিমবঙ্গকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। কেন্দ্রীয় স্তরেও কংগ্রেস দুটি ভাগে ভেঙে গিয়েছিল এবং তার ক্ষতিকর অংশটি ইন্দিরা কংগ্রেস নামে ক্ষমতাসীন হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গে তার অংশবিশেষ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধীর পদলেহন এবং পুচ্ছ আস্ফালন শুরু করেছিল। পুরনো কংগ্রেসের ভালো অংশটি আদি কংগ্রেস হিসেবে প্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে টিকে গেলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ বলা যায় সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে এসে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি মাত্র শক্তিই অবশিষ্ট ছিল, একটি সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড খ্যাত বামেরা অর্থাৎ সিপিএম; দ্বিতীয়টি রাজ্যজুড়ে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড চালানো মাওবাদীরা এবং তৃতীয়টি অদূর ভবিষ্যতে বরানগর হত্যাকাণ্ড হটানো ইন্দিরা কংগ্রেস। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জনসঙ্ঘ এবং বিধান রায়ের আদি কংগ্রেস এই দুই দলই তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে প্রায় মুছে গেছে । পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে তখন থেকেই শুরু হয়েছে দুর্যোগের ঘনঘটা । এরপরে ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ক্ষমতায় এসেছেন নিরঙ্কুশভাবে এবং এসেই ঘটিয়েছেন বরানগর হত্যাকাণ্ড। ওর আমলে মাওবাদীরা দমিত হলেও আরেক বামপন্থী শক্তি সিপিএম পল্লবিত হয়েছিল। ওর নিজের দল ইন্দিরা কংগ্রেসের (যা মূলত গুন্ডাদের দ্বারাই গঠিত হয়েছিল) অত্যাচারেও মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। ফলস্বরূপ ৭৭ সালে তাঁর পতন হয়েছিল এবং ক্ষমতায় এসেছিল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে সিপিএম অর্থাৎ ডাঙার বাঘের বদলে জলের কুমির, বাসের পকেটমারের বদলে রাস্তার গাঁটকাটা। এরপরে দীর্ঘ ৩৪ বছর চলেছিল এই সিপিএমেরই রাজত্ব, ধ্বংস আর হত্যার এক একঘেয়ে বিবরণ। একদিকে মরিচঝাঁপি গণহত্যা থেকে শুরু করে বিজনসেতু, ধানতলা, বানতলা ইত্যাদি একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে; অপরদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জুতোপেটা করা থেকে শুরু করে রাজ্যের সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নেমে এসেছে দলতন্ত্রের আঘাত । একদিকে নিরাপত্তাহীনতায় রাজ্যের একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়ে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে অবদান শূন্যে এসে থেকেছে, অপরদিকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাও নেমে পড়েছে অধঃপতনের চরমতম সীমায়। এককালে, স্বর্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে নেমে এসেছে নরকের অন্ধকার, আর সেই নরকের অন্ধকারে বামপন্থী ভূত পিশাচের হাড়হিম নৃত্য।

বহুদিন পরে পরিবর্তন এসেছিল ২০১১ সালে। ততদিনে পশ্চিমবঙ্গের মৃতদেহটুকুই টিকে আছে। এককালে গোটা দেশের জিডিপির ২৫ শতাংশের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ ২০১১ সালে গোটা দেশের জিডিপির মাত্র নয় শতাংশের অধিকারী হয়ে দাঁড়ালো। সেই সময় ঘটা পরিবর্তনে ক্ষমতাসীন হলো ওই ইন্দিরা কংগ্রেসেরই উপজাত গোষ্ঠী তৃণমূল কংগ্রেস। প্রাথমিকভাবে অনেকেই ভেবেছিলেন রাত্রির অবসানে নতুন ভোরের উদয় হলো। তবে কিছু সময় পরেই বোঝা গেল 'এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার!' পরিবর্তন হলো নামেই , কার্যত রয়ে গেল একই শাসন। কারণ ইন্দিরা কংগ্রেস ও সিপিএমের মতো এই তৃণমূল কংগ্রেস দলটিও শুধুমাত্র গুন্ডাদের নিয়েই গঠিত ছিল। তাই এদের আমলেও দেখা গেল আগেকার সিপিএমের আমলের মতোই খুন জখম আর অত্যাচার, শিল্প আর শিক্ষাকেন্দ্রকে ধ্বংস করার একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। কামদুনি থেকে সন্দেশখালি, রায়গঞ্জ থেকে মুর্শিদাবাদ— একই হাহাকার । এদের হাতেও কেটেছে ১৫টি বছর, এখন আবার নতুন পট পরিবর্তনের সময় হয়েছে ।

আনন্দমঠে বর্ণিত, 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন'- এর মূর্তিত্রয়ের মতোই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা। এককালে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল স্বর্গসদৃশ উন্নত, পরে বর্তমানে এর অবস্থা হয়েছে নরকের চেয়েও খারাপ। ভবিষ্যতে হতে পারে পূর্বের স্বর্গালোকের চেয়েও ভালো। কিন্তু সেই ভালো হওয়া নির্ভর করছে রাজ্যবাসী চয়ন ক্ষমতার ওপর। আসন্ন '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গবাসী যদি একসময়ের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রের এবং শিক্ষাক্ষেত্রের রূপকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্থাপিত রাজনৈতিক দল জনসঙ্ঘের বর্তমান রূপ বিজেপিকে চয়ন করে আগামীর কাণ্ডারি হিসেবে, একমাত্র তাহলেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতে আশার আলো দেখা যাবে। আর চয়নে যদি ভুল হয়, বিজেপির বদলে অন্য কোনো দলকে যদি পশ্চিমবঙ্গবাসী চয়ন করে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শেষের সেদিন বড়ো ভয়ঙ্কর হবে। আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে তাই পশ্চিমবঙ্গবাসীকে নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, চয়ন করতে হবে আগামীর সঠিক কাণ্ডারিকে। একমাত্র তবেই পশ্চিমবঙ্গ আবার বেঁচে উঠবে। □

বঙ্গের চতুর্থ পুনর্জাগরণ

সহযোগী সমাজ-সৃষ্টির পথে বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ ভূমিকা

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

বঙ্গের ইতিহাসের দিকে তাকালে একটি বিস্ময়কর সত্য উপলব্ধি করা যায়। তা হলো, এই ভূমির জীবনধারা স্থির নয়, এটি পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় আবর্তিত। পতন এসেছে, কিন্তু সেই পতনের ভিতর থেকেই আবার নতুন শক্তির জন্ম হয়েছে। এই কারণেই বঙ্গভূমিকে কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বলা যায় না। এটি একটি ঐতিহাসিক সৃজনশীলতার ক্ষেত্র। আধ্যাত্মিকতার ভাবভূমিও। বঙ্গের প্রসারিত অতীত বিশ্লেষণ করলে অন্তত তিনটি মহান জাগরণ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে; প্রথমত, মহারাজা শশাঙ্ক ও পালযুগের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্থান, দ্বিতীয়ত, শ্রীচৈতন্য যুগের মানবিক ও সামাজিক ঐক্যের আন্দোলন এবং তৃতীয়ত, উনিশ শতকের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মনে হয়, বঙ্গ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ আবার এক গভীর সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা, শিল্পের অবক্ষয়, সামাজিক বিভাজন এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব তথা স্বপ্নহীনতার সংকট এই প্রদেশের শক্তিকে দুর্বল করেছে। এই পরিস্থিতিতে ইতিহাস যেন আমাদের সামনে আবার একটি নতুন দায়িত্ব এনে দিয়েছে; পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাই আর একটা আস্ত পুনর্জাগরণ। যাকে বলতে পারি, তার চতুর্থ পুনর্জাগরণ।

বাঙ্গালির প্রথম জাগরণ-যুগ

বঙ্গের প্রথম ঐতিহাসিক উত্থান ঘটে সপ্তম শতকে গৌড়েশ্বর মহারাজা শশাঙ্কের সময়ে। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গ প্রথমবার সুসংহত রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গাব্দের প্রবর্তনের মধ্যে যার গুরুত্বের স্বীকৃতি। পরবর্তী পালযুগে সেই শক্তি আরও বিস্তৃত হয়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর মহাবিহার— এই সব বিদ্যাপীঠের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির মাধ্যমে বঙ্গ ভারতীয় জ্ঞানচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই যুগের একটি বড়ো শিক্ষা হলো,বঙ্গের শক্তি বিচ্ছিন্নতায় নয়। বরং দেখা গেছে, বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকার দ্বারাই তার বিকাশ। যুগে যুগে তার প্রভূত প্রমাণ রয়েছে ছড়িয়ে। বঙ্গের যে প্রথম জাগরণযুগে মহারাজা শশাঙ্ক বঙ্গের সীমাকে বিহার ও ওড়িশার কতক অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে পাল আমলেও সে বিস্তার শুধু অব্যাহত থেকেছে তা নয়, সর্বভারতীয় তথা বিশ্বভর বৌদ্ধমতকেও তাঁরা আত্মস্থ করে বাঙ্গালিকৃত করে নিয়েছেন। এতোটাই করে নেন যে, বৌদ্ধমত সনাতন ধর্মের থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্রমশ তাতেই আবার লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। যেন, ''তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহরী সমানা'। এভাবেই বাঙ্গালিত্বের আদি লক্ষণের মধ্যেও সর্বভারতীয়তার সংমিশ্রণ ছিল অবাধ। সুদূর এক সময়ের 'ব্রাত্য' বঙ্গ এভাবেই নিজস্বতায় চিহ্নিত হয়েও ভারতীয়তায় অন্বিত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় জাগরণ ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিরে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন সমন্বয়েরই প্রতীক। সমন্বয় একদিকে সন্নিহিত সমাজের মধ্যে। সব আমরা-তোমরার মধ্যে। অন্য দিকে সর্বভারতীয়তার সঙ্গেও। তাঁর ভক্তি আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ ছিল না। এটি ছিল এক গভীর সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক বিপ্লব। শ্রীচৈতন্যদেব সমাজের উঁচু-নীচু বিভাজন ভেঙে মানুষের হৃদয়ের ভক্তিকে প্রধান করে তুলেছিলেন। ভক্তকেও ঈশ্বরের তুল্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুর গৃহ-প্রত্যাবর্তনের আদি ইতিহাস তাই তাঁরই দ্বারা রচিত হয়। তাঁর আন্দোলন বঙ্গের লোকজ সংস্কৃতিকে সর্বভারতীয় ভক্তিধারার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। সেখানে দক্ষিণ ভারতের রামানুজ ও মধ্বাচার্যকে যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে উত্তর ভারতের মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ কথারও প্রবল প্রতিধ্বনি। এইভাবে বঙ্গ সেদিন বাঙ্গালিত্বের চরিতার্থতা তথা সম্পূর্ণতা খুঁজেছিল ভারতীয়ত্বের আঙ্গিকেই। ভারতীয়তার আতপত্রেই তার বিকাশ, তার সমৃদ্ধি, তার বৃহত্তর অস্মিতা। কোনো খণ্ডিত অস্মিতা নয়। বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্বের ফ্রেমেই নিহিত ছিল তার যোড়শ শতকী নবজাগরণের প্রকৃত প্রাণশক্তি।

তৃতীয় জাগরণ : উনিশ শতকের নবজাগরণ

এ ছিল এক অসাধারণ বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আত্মিক জাগরণ। এই সময়ে বাঙ্গালির দ্বারে শুধু ভারত নয়, বিশ্ব এসেও কড়া নেড়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় তার চিন্তা, সাহিত্য, দর্শন ও সমাজচেতনা এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছায় ঐতিহ্যের শিকড়কে পুষ্ট করেই। বস্তুত, এই নবজাগরণের প্রধান পুরুষরা ভারতীয়তার গভীর শিকড়ে প্রোথিত থেকেই বিশ্বসংস্কৃতির আলোকেই দোহন করে নিয়েছিলেন। ভারত তথা বিশ্বের কাছ থেকে গ্রহণ করেই ভারত তথা বিশ্বকে তাঁরা অভূতপূর্ব রকমে স্পন্দিত করে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর,বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' বঙ্গভূমির প্রতি প্রেমের প্রকাশ হলেও দ্রুতই তা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহামন্ত্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্ররচিত 'ভারত ভাগ্যবিধাতার' বন্দনাগানও হয়ে উঠলো সর্বভারতীয়তারই অনন্য স্মারক ও সন্ধান। 'অভীঃ' ও 'উত্তিষ্ঠত' মন্ত্রও ভারতীয়তার শিকড় থেকেই পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আত্মশক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সেই প্রবুদ্ধ বাণীকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বহির্ভারতেও।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই সমাজের শক্তিকে জাগ্রত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের উভয়ের মতেই জাতির পুনর্জাগরণের মূল শক্তি নিহিত থাকে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনে, সমাজশক্তির জাগরণে। রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতীয় পুনর্জাগরণের মূল ভিত্তি ছিল সমাজ। রাজনীতি নয়। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যমেই কৃষি, শিল্প এবং গ্রামীণ জীবনের সমন্বিত উন্নয়নের যে মডেল নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তা সেদিনের জন্যও যেমন, আজকের বিশ্বের জন্যও অনন্য এক আলোকবর্তিকা। শ্রীঅরবিন্দ তো সারা

বিশ্বের জন্যই ভারতের পুনরুত্থানের মন্ত্র জপেছেন। তাঁর প্রত্যয়ী প্রার্থনা ছিল 'India is rising– not for herself alone but for the future of humanity.' অর্থাৎ বাঙ্গালি শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় পুনর্জাগরণকে মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন।

উনিশ শতকের বঙ্গ-মনীষার মূল শিক্ষাটাই ছিল— জাতির উন্নতি কেবল রাজনীতির মাধ্যমে সম্ভব নয়। বিচ্ছেদের মাধ্যমেও নয়। সম্ভব যোগের মাধ্যমে। সম্ভব সমাজশক্তি তথা অধ্যাত্মশক্তির জাগরণের মাধ্যমে। শিক্ষা, চরিত্রগঠন, উদ্যোগ ও সমাজসংগঠন— এই চারটি স্তম্ভের উপর তাঁরা জাতীয় পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গকে তাঁরা কেউই ভারত-বিযুক্ত করে দেখেননি।

গত পঞ্চাশ বছরের সংকট

স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়েছিল বিদেশের অনুকরণে স্বদেশ পরিচালনার ব্যবস্থা। আমরা যেন কোন এক দাসত্বের আবেশে যাকে ঘৃণা করে তাড়িয়েছি, লোলুপ দৃষ্টিতে তাকেই অনুকরণ করতে বসে গেছি। বিগত পঞ্চাশ বছরে আবার পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারা গড়ে ওঠে যা অনেকাংশে বিদেশ থেকে ধার করা সমাজতান্ত্রিক মডেলের প্রভাবেই পরিচালিত হয়েছিল। কেন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও বিরোধের পথেই এরাজ্যের লাভ মনে করতে শিখেছিল। কিন্তু তা খুব-গরিব আর কিছু কম-গরিবের মধ্যে 'লড়াই-লড়াই- লড়াই' লাগিয়ে দারুণ কিছু করে ফেলেছি বলে আত্মসন্তুষ্টির মধ্যে গাঁজিয়ে ওঠে। তাদের এই মডেলের উচ্চারিত লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাস্তবে সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি ও উদ্যোগের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে তাদের ঠুনকো সমাজতন্ত্রের দিশাহীন হিংস্রতায়। শিল্পের অবক্ষয়, কর্মসংস্থানের সংকট এবং উদ্যোগের অভাব পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে কেবলই দুর্বল করতেই থেকেছে। বাঙ্গালি দিনমজুর হিসেবে রাজ্যে রাজ্যে, কখনও-বা দেশের বাইরেও বেরিয়ে পড়েছে। কোনো কোনো রাজ্যে 'বাঙ্গালি' বলতে 'দিনমজুর'-কেই বোঝাতে শুরু করেছে। বামফ্রন্টের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এটা।

এই দিশাহীন হিংস্রতার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় নতুন একধরনের সাম্প্রদায়িকতা। যাকে বলে, দলীয় সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পরে দলীয় রাজনীতির চরমপন্থা সমাজকে সীমাহীনভাবে বিভক্ত করতে থাকে। বিশেষ করে জেহাদি গোষ্ঠীকেও বিশেষভাবে প্ররোচিত করতে থাকে। ফলে সমাজের স্বাভাবিক সমন্বয়ীশক্তির সংগঠিত হওয়ার সুযোগ যেমন কমে গেছে, দলীয়তাই সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস উৎস হিসেবেও চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। এভাবেই বাঙ্গালি সমন্বয়ের সনাতনী প্রজ্ঞা থেকে চ্যুত হয়ে বিরোধ ও বিদ্বেষের অন্ধ আবর্তের দিকে কেবলই ধেয়ে চলেছে।

সমাজ-রাজতন্ত্রের ধারণা

এই পরিস্থিতিতে বাঙ্গালির পুনর্জাগরণের জন্য একটি নতুন চিন্তার প্রয়োজন— 'সমাজ-রাজতন্ত্র'। কথাটির প্রথম এবং সম্ভবত শেষ উচ্চারণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সমাজ-রাজতন্ত্র বলতে সেদিন রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন এমন একটি সামাজিক কাঠামো, যেখানে সমাজের সংগঠিত শক্তি সরকারের উপর নির্ভর না করেই নিজস্ব উদ্যোগে উন্নয়নের পথ তৈরি করবে। সেদিন বিদেশি শাসন থাকায় সরকার ও সমাজের পরস্পর পরিপূরকতার ব্যাপারটি তাঁর চিন্তায় প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। ভারতের ঐতিহ্যে সমাজ-প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত। গ্রামসমাজ, মঠ-মন্দির, শিক্ষাকেন্দ্র---এসব প্রতিষ্ঠান সমাজকে সংগঠিত করত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে সে-সত্যের অনতিস্পষ্ট হলেও একটা দৃশ্যমান রূপরেখা কিন্তু আমরা পাই।

আধুনিক যুগে এই ধারণাকে নতুনভাবে রূপ দিতে হবে যুগের উপযোগী করে। আজ দল ও প্রশাসনের অতি শীর্ণ সংখ্যক মূলচ্যুত কিছু মানুষ সংলগ্ন বৃহৎ জনসাধারণকে বৃহৎ একটা সংখ্যামাত্র মনে করে। উচ্চতর সমাজ ও আধ্যাত্মিক চেতনার অভাবে তাদেরকে মানুষ বলে ঠিকমতো ঠাহর করে উঠতে পারে না। সমাজের নিযুক্ত সেবকেরা দেখতে দেখতে সেবা-অপহারক বা প্রাপক-মাত্র হয়ে ওঠেন। এখানেই প্রয়োজন মুখোমুখি

খাঁটি গুঁড়ো মশলা মানেই গণেশ গুঁড়ো মশলা

Ganesh SINCE 1936

সকল প্রকারের গণেশ গোটা এবং গুঁড়ো ও মিক্স মশলা পাওয়া যায়।

GANESH CONSUMER PRODUCTS LIMITED

88, Burtolla Street

Kolkata - 700 007, Ph. 033 66336633

মানব-সম্পর্কের এক প্রশস্ত বাতায়নের। এইখানেই প্রয়োজন সমাজের সমুত্থানের।

একুশ শতকে সমাজকে ধারণ করবে কে?

সমাজকে সংগঠিত ও সঞ্চালিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতো। কিন্তু তারা খুচরো কিছু পরিষেবা দিয়েই সচরাচর গদগদভাবে নিজের পিঠ নিজেই এমন চাপড়াতে শুরু করে যে, তাদের পরিষেবা নিতান্ত অকিঞ্চিতকরতায় পর্যবসিত হয়। তারা একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশমাত্র হয়ে থাকে। সভ্যতা-সঞ্চালনার সৃষ্টিশীল কোনো প্রক্রিয়ার সৃজক হয়ে উঠতে পারে না। এইখানেই চাই উনিশ শতকের মনীষীদের ভাবনা এবং আধুনিক সমাজসংগঠনের সংকল্প। এই দুইয়ের মিলন ঘটিয়ে সরকারি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গে চাই সেইরকম একটি নতুন সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র, যা ভারতীয়তার আধারেই আধুনিক যন্ত্রশক্তি, সমাজশক্তি ও মানুষের অন্তর-গত অপার আত্মশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলবে চিরন্তনের পটে চিরনতুনের সম্ভাবনা-শক্তি।

এমনই একটি সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু স্বপ্ন নয়, সূচনাও করেছিলেন। শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতনকে ঘিরে বিশ্বভারতীর প্রসারিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে যা পূর্ণতাপ্রাপ্তির আপেক্ষায় ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয়করণের ফলে সেই বিশ্বভারতী যেন অভিশপ্ত অহল্যার মতোই জীবাশ্মভূ ত হয়ে আছে সঙ্গীত ও নৃত্যের সমৃদ্ধ 'আচারে', চোখ-ধাঁধানো জৌলুসের অলক্ষ্য অন্তরালে, স্তম্ভিত হয়ে। যেন শাপমুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেই আকুলা সে আজ। নিজের স্বরূপশক্তির যথাযথ প্রকাশের আর্ত প্রার্থনায় স্তব্ধ আসনে কোনোমতে তার অঙ্কুর-কাল (স্মরণ করুন রবীন্দ্র-উক্তি : এখনো অঙ্কুর যাহা তারি পথপানে/প্রত্যহ প্রভাতে রবি আশীর্বাদ আনে) আজ অতিক্রম করছে সে।

এখানে পুনশ্চ স্মরণ করতে হবে, বিশ্বভারতী বিল অনুমোদনের সময় সংসদে যে আলোচনা হয়েছিল, সেখানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমূহ সতর্কবাণী। আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যাতে সে হয়ে না পড়ে, এ বিষয়ে তাঁর নিরতিশয় দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আজ স্বতঃপ্রমাণিত। বাঙ্ময়, ভাস্বর বিশ্বভারতী নিজেকে গোটাতে গোটাতে আজ বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই যেন আর। তার সে গৌরবেও ভাগ বসিয়েছে, তারই উঠোনে সহসা হাজির-হওয়া হতবাক বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ও।

সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সূত্রধরের সন্ধানে

রামকৃষ্ণ মিশন, শান্তিনিকেতন ও পণ্ডিচেরী সমাজের সংকীর্ণ প্রান্তে বিশেষভাবে সংকুচিত হয়ে থাকায় সমাজোত্থানে সামগ্রিক কোনো নেতৃত্ব দিতে তারা অনেকটাই অপারগ হয়ে আছে আজ। শাসনের সর্বগ্রাসী আধিপত্যের যুগে সমাজের সূত্রধরের সার্বিক কাজে, কোনো অলক্ষ্য সমাজ-বন্ধনীরূপে তাদের কোনো ভূমিকাই ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই প্রতিবেদকের দল যখন উত্তরাখণ্ডের রামগড়ে 'দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন' গড়ার লক্ষ্যে নিযুক্ত হয়েছিল, তখন তাদের মনের মধ্যে ছিল সমাজ-নেতৃত্বের সেই শূন্যতাকে পূরণ করার সংকল্প; ওই রামগড় ব্লককে শূন্য-আবর্জনা, শূন্য-বেরোজগার ব্লকে পরিণত করার কাজ কীভাবে করা যায়, তার পন্থা পরিকল্পনার চিন্তা। পরিবেশ, কৃষি ও স্বরোজগার সংক্রান্ত সংকটের নিরসনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অনন্য ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার কথা।

সেদিনের সেই প্রয়াসক্রমে রামগড়ের উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা হাজার কোটি টাকার ঘোষণা পর্যন্ত এগিয়ে আপাতত থমকে রয়েছে। মূলত আজকের বিশ্বভারতীর অনুদ্যোগ ও অপ্রস্তুতির কারণে। এমন সময়েই ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নামে পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উঠেছে। আমাদের প্রস্তাব, থমকে-যাওয়া সে উদ্যোগের প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে শ্যামাপ্রসাদের নামে এমন কিছু হোক, যা বিশ্বভারতী সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কাকে মূল্য দিয়ে পরিবেশ, কৃষি ও স্বরোজগারের সংকট মোচনে এক নির্ণায়ক ভূ মিকা পালন করতে পারে। সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও ভবিষ্যতে ক্রমশ কেমন করে যুক্ত হতে পারবে সেই কর্মকাণ্ডে, দিশা জোগাবে তারও। তাতেই সম্ভবত দল ও প্রশাসনের নিষ্ফলা অতি-আধিপত্যের অর্থপূর্ণ পরিপূরক এক বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে, তাদের নিছক নিন্দামন্দায় বৃথা সময় না কাটিয়ে।

শ্যামাপ্রসাদ প্রসপারিটি পলিভার্সিটি

প্রস্তাবিত নতুন এই আন্দোলনের একটি কেন্দ্র হতে পারে এই পলিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি তাকে না-ই যদি বলি। কারণ, এটি কেবল একটি বেকারত্ব উৎপাদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকবে না। হয়ে উঠবে বরং একটি বহুমুখী জ্ঞান ও উদ্যোগকেন্দ্র। এখানে থাকবে শিক্ষাকৃষি ও পরিবেশপ্রযুক্তি, থাকবে শিল্পোদ্যোগ ও স্বনিযুক্তি। থাকবে শ্রীনিকেতনের একটি সঞ্জীবিত রূপ। এই প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জাগরণের ঐতিহাসিক এক পরীক্ষাগার। এই সুযোগে সর্বভারতীয় যে যে সংস্থা বহুদূর পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে সদৃশ চিন্তার পোষকতা করে চলেছে, চেষ্টা করবে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে। বস্তুত পক্ষে, মহারাষ্ট্রে সমাজ-আন্দোলনের সক্রিয় এই ধারাটির প্রতি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত।

তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, যে সমাজ-আন্দোলনের তিনি অবিরাম পোষকতা করে চলেন, পশ্চিমবঙ্গে তা কেন তেমন জোর পায় না, যা মহারাষ্ট্রে পায়? আমাদের মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের এই সীমাহীন অস্তিত্ব-সংকটের মধ্যে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এর উত্তর খুঁজলেই চলবে না শুধু, পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পথেও নামতে হবে। পরস্পরের দ্বারা প্রবুদ্ধও হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ একবার ডাক দিয়েছিলেন— 'মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালি এক সাথে চলো মহোৎসবে আজি। ..... 'আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব দক্ষিণে ও বামে একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব এক পুণ্য নামে।' রবীন্দ্রনাথের সেই আহ্বানকেই সর্বোচ্চ মান্যতা দিতে হবে আজ।

শ্যামাপ্রসাদ প্রসপারিটি পলিভার্সিটি হতে পারে বিদীর্ণ বাঙ্গালির সেইরকম একটি মিলন ও উন্মীলন-ক্ষেত্র, যেখানে রবীন্দ্র-আদর্শে কোটি কোটি গ্রামবাসী বাঙ্গালির অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও সুরক্ষা শুধু নিশ্চিত হবে না, গ্রাম-শহরের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানও সম্ভব হবে। যার খুঁটিনাটি প্রকল্প-পরিকল্পনা, মানতেই হবে, সকলের সঙ্গে যোগে স্বতন্ত্রভাবেই করণীয়। আমরা তার সম্ভাব্য প্রাথমিক রূপরেখাই উপস্থাপিত করবো একে একে।

বঙ্গের ইতিহাস আমাদের একটি বড় শিক্ষা দেয়। আমরা দেখি, যখনই বাঙ্গালি নিজের ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছে এবং বৃহত্তর ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তখনই তার শক্তি বিকশিত হয়েছে। শশাঙ্ক থেকে শ্রীচৈতন্য হয়ে উনিশশতক; সব সময়ের পক্ষেই যা সত্য হয়েছে। শশাঙ্কের শৌর্য, চৈতন্যের সমন্বয়-সন্ধান, বঙ্কিমের দেশপ্রেম, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের আত্মশক্তি ও সমাজদর্শন এবং শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি— এই সবের মিলনেই বঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্মিত হতে পারে। বঙ্গজ আমরা যদি সমাজের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় সেই শক্তিকে যদি নানামুখী সৃজনশীল উদ্যোগে রূপান্তর করতে পারি, তবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে আবারও নতুন যুগের সূচনা সম্ভব। সেই নতুন যুগ, যা চতুর্থ পুনর্জাগরণ সাধন করবে। □

মহারাজা শশাঙ্ক প্রবর্তিত বাংলা নববর্ষ

প্রতাপ চন্দ্র জোয়াদ্দার

বাংলা নববর্ষ ও বাংলা পঞ্জিকার সৃষ্টি তথা বঙ্গাব্দ সৃষ্টি হয়েছে মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের সময়কাল থেকে। গুপ্তযুগের বহুকাল আগের নিয়ম অনুসারে নতুন সম্রাটরা সিংহাসনে বসার সময়কাল থেকে নতুন বর্ষপঞ্জী শুরু করতেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়াঘাটের কাছে কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানে গুপ্তযুগের শেষের দিকে রাজধানী স্থাপন করে মহারাজা শশাঙ্ক ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং বঙ্গাধিপতি হন। প্রাচীন রীতি অনুসারে তিনি তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় থেকেই ভারতের কালগণনার প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্ত পদ্ধতি মেনে ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পয়লা বৈশাখ বা বঙ্গাব্দের সূচনা করেন। সেই থেকেই বঙ্গে শুরু হয় বাংলা নববর্ষ এবং পরবর্তী কালে সেই হিসেব ধরেই তৈরি হয় বাংলা ক্যালেন্ডার। বর্তমান ইংরেজি খ্রিস্টাব্দ থেকে মহারাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের ৫৯৩ সাল বাদ দিলেই বাংলা সালের হিসেব পাওয়া যাবে অর্থাৎ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বাদ দিলে আজ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালের তথাকথিত গবেষকদের মত হলো, বাদশা আকবরের খাজনা আদায়ের সূত্র ধরে মুর্শিদাবাদে নবাবদের শাসনকাল থেকে নাকি বঙ্গাব্দ শুরু হয়। খাজনা আদায়ের সুবিধার কারণে যদি একটি প্রদেশে নতুন ক্যালেন্ডার তৈরি করা হতো তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও পয়লা বৈশাখের মতো আলাদা আলাদা ক্যালেন্ডারের সৃষ্টির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত। স্কুল-কলেজের ইতিহাস সিলেবাসে বঙ্গাব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন কোনো পাঠ্য না থাকার কারণে এই ভুল ধারণাটি তৈরি হয়েছে। বঙ্গে ইসলাম অনুপ্রবেশের অন্তত ৬১০ বছর আগে বাংলা বছর তথা বঙ্গাব্দের সূচনা হয়।

যদি ভারতীয় সংস্কৃতির জ্যোতির্বিজ্ঞানের কালপঞ্জীর ইতিহাসের

দিকে আলোকপাত করা হয় তবে দেখা যাবে খ্রিস্টজন্মের পর খ্রিস্টাব্দ বা ইংরাজি সাল শুরু হয়, কিন্তু তার থেকেও অনেক অনেক বছর আগে বেদ রামায়ণ কাল থেকেই ভারতীয় বর্ষপঞ্জীর ব্যবহার রয়েছে। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সময়ে শুরু হওয়া বিভিন্ন বর্ষপঞ্জী রয়েছে,সেগুলো হলো সৃস্টাব্দ,যুগাব্দ,কল্পাব্দ,বিক্রম সম্বৎ,কল্যাব্দ ইত্যাদি। হিন্দু সংস্কৃতিতে বর্তমানে ১৯৭, ২৯,৪৫,১২৮ বছর সৃষ্টি সংবতের কলি যুগাব্দ ৫১২৮ চলছে এবং বিক্রম সম্বৎ বর্ষপঞ্জী অনুসারে গত ১৯ মার্চ,২০২৬ দিনটি ছিল ভারতীয় নববর্ষ তথা ২০৮৩ সালের শুরু। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা এখনো এই বর্ষপঞ্জী অনুসারে চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদে ভারতীয় নববর্ষ পালন করেন। ৬০০ খ্রিস্টাব্দের গোঁড়ার দিকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আরবীয় লুটেরাদের প্রবেশ ও তাদের শাসন কায়েম হবার পর থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আঘাত আসতে শুরু করে। কয়েকজন বামপন্থী ইতিহাসবিদ- সহ একজন নোবেল জয়ী বাম বিদ্বান উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই দাবি করেন বাংলা নববর্ষ নাকি আকবরের সৃষ্টি এবং এর স্বপক্ষে তারা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে,আকবরের সময় কালে হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে বঙ্গপ্রদেশ থেকে খাজনা আদায় করতে অসুবিধা হতো, সেই কারণে নাকি বাংলা ক্যালেন্ডার চালু করা হয়। বামপন্থী ইতিহাসবিদদের এই যুক্তি খণ্ডন করে একাধিক ইতিহাসবিদ জানিয়েছেন, আকবরের পিতামহ বাবরের জন্ম ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে, তার কয়েকশো বছর আগে থেকেই বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজকর্মে বঙ্গাব্দ বা বাংলা দিনপঞ্জি ব্যবহারের কথা জানা যায়। বাঁকুড়া জেলায় এক প্রাচীন মন্দির ১২০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে নির্মাণের সময় মন্দিরের গায়ে বঙ্গাব্দের উল্লেখ রয়েছে। এই মন্দির নির্মাণের প্রায় ৩০০ বছর পর আকবর সিংহাসনে বসেন। অর্থাৎ যা থেকে প্রমাণ হয় আকবরের জন্মের আগে থেকেই বঙ্গাব্দের ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং পয়লা বৈশাখ তথা বাংলা নববর্ষ আকবরের দ্বারা সৃষ্টি নয় সেটা নিশ্চিত।

ইতিহাসবিদদের গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, মহারাজা শালিবাহন যুদ্ধ জয়ের পর শকাব্দের সূচনা করেছিলেন, তা অনুকরণ করে শশাঙ্ক বঙ্গদেশে বঙ্গাব্দ শুরু করেন। ভারতবর্ষে প্রায় আটশো বছর ধরে ইসলামি শাসন এবং পরবর্তীতে ইংরেজদের শিক্ষা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার কারণে ভারতীয় বর্ষপঞ্জীগুলির ব্যবহার আধুনিক প্রজন্মের কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী তথাকথিত বিদ্বজ্জনেরা বাংলা পঞ্জিকা সৃষ্টির ইতিহাসে আকবরের নাম অনুপ্রবেশ করাতে সচেষ্ট হলেও সম্প্রতি নতুন প্রজন্মের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির মাধুর্য ফিরিয়ে আনার উৎসাহ দেখা দেবার ফলে প্রাচীন বিষয় গুলি আবার চর্চায় ফিরে আসছে। □

বাংলা নববর্ষ ও বাঙ্গালি হিন্দু মহিলাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

অরুণা রায়চৌধুরী

বাংলা নববর্ষ, যা 'পয়লা বৈশাখ' নামে অধিক পরিচিত, বাঙ্গালি জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বন্ধন ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতিফলন। বিশেষ করে বাঙ্গালি হিন্দু মহিলাদের জীবনে এই দিনটির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক। তাঁদের পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যসংস্কৃতি এবং সামাজিক ভূমিকা সবকিছুর মধ্যেই এই উৎসবের বিশেষ ছাপ দেখা যায়।

বঙ্গের সার্বভৌম স্বাধীন সম্রাট মহারাজা শশাঙ্ক এই বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দিনটি ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। তবে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজে এই দিনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার, যেখানে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পয়লা বৈশাখের সকালে বাঙ্গালি হিন্দু মহিলারা খুব ভোরে উঠে স্নান করে নতুন শাড়ি পরিধান করেন। সাধারণত সাদা-লাল পাড়ের শাড়ি এই দিনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই পোশাক বাঙ্গালির ঐতিহ্য ও শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। লাল টিপ, শাঁখা-পলা, সিঁদুর ইত্যাদি অলংকারে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন। এই সাজ শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক গর্বিত বহিঃপ্রকাশ।এই দিনে মহিলারা ঘরের মেঝেতে আলপনা আঁকেন, যা বাঙ্গালি সংস্কৃতির এক প্রাচীন শিল্পরীতি। আলপনা শুধু শৌখিনতা নয়, বরং শুভ শক্তিকে আহ্বান এবং অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচারগুলির মধ্যে অন্যতম হলো গৃহদেবতা ও লক্ষ্মী-গণেশের পূজা। ধূপ, প্রদীপ, ফুল, ফল ও মিষ্টি নিবেদন করে দেব-দেবীর আরাধনা করা হয়। লক্ষ্মীদেবীকে ধন-সম্পদের ও গণেশকে সিদ্ধি ও মঙ্গলদাতা

হিসেবে পূজা করা হয়, যাতে নতুন বছরটি সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এছাড়া অনেক বাড়িতে 'ঘট স্থাপন' করা হয়, যা একটি শুভ প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। একটি পাত্রে জল ভরে তার ওপর আমপাতা ও নারকেল বসিয়ে এই ঘট স্থাপন করা হয়। এটি সমৃদ্ধি ও জীবনের ধারাবাহিকতার প্রতীক। এই আচারটি মহিলারাই সযত্নে সম্পন্ন করেন।

ব্যবসায়ীরা নতুন খাতা বা 'হালখাতা' খুলে পূজা করেন, যেখানে মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ও সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। খাবারদাবারের ক্ষেত্রেও মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চাটনি, পায়েস ইত্যাদি। যদিও পান্তা-ইলিশ এখন বেশি জনপ্রিয়, তবে ঐতিহ্যগতভাবে নিরামিষ ও আমিষ উভয় ধরনের পদই রান্না করা হয়। এই সমস্ত রান্নার মাধ্যমে মহিলারা শুধু পরিবারের সদস্যদের আনন্দ দেন না, বরং বাঙ্গালির খাদ্যসংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদিতে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা এই অনুষ্ঠানগুলির আয়োজক হিসেবেও কাজ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের প্রতিভা প্রকাশের পাশাপাশি সমাজে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেন।

বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালি হিন্দু মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র উৎসব নয়, বরং আত্মপ্রকাশ ও সামাজিক সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই দিনে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করা, প্রণাম করা, মিষ্টি বিতরণ করা সবকিছুই সামাজিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ গ্রহণ ও ছোটোদের স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

বর্তমান যুগে আধুনিকতার প্রভাবে অনেক কিছু বদলালেও বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য এখনো অটুট রয়েছে। আধুনিক পোশাক বা রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া যুক্ত হলেও, মহিলারা এখনো ঐতিহ্যবাহী শাড়ি, গয়না ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনের গুরুত্ব বজায় রাখেন। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তাঁরা এই উৎসবের ছবি ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বিশ্বব্যাপী বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

এছাড়াও, বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালি হিন্দু মহিলাদের ক্ষমতায়নের এক প্রতীক হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এই দিনে তাঁরা শুধু গৃহস্থালির কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করেন। অনেক মহিলা উদ্যোক্তা এই সময়ে নিজেদের তৈরি পোশাক, গয়না বা খাবার বিক্রি করেন, যা তাঁদের আত্মনির্ভরতার দৃষ্টান্ত।

সর্বোপরি, বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালি হিন্দু মহিলাদের জীবনে এক গভীর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করে। তাঁদের অংশগ্রহণ ছাড়া এই উৎসব কখনোই পূর্ণতা পায় না। পোশাক, খাদ্য, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা এই দিনটিকে জীবন্ত ও অর্থবহ করে তোলেন। তাই বলা যায়, বাংলা নববর্ষ শুধু একটি দিন নয়, এটি বাঙ্গালি নারীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

সব ঋতুতেই নিমপাতা খাওয়া ভালো

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

বসন্তকালে খয়েরি লালচে কচি নিমপাতা খাওয়ার রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকে আজও অবধি সমানে চলে আসছে।

চরক সংহিতায় শিশুর জন্মমুহূর্তেই নিমপাতা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসবগৃহের বাতাস শুদ্ধ রাখতে সদ্যোজাত শিশুকে বিভিন্ন জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে, ধাইমা-র শরীর, কাপড় জীবাণুমুক্ত রাখতে, আবার শবদাহ করার পর শ্মশান থেকে শবযাত্রীরা ফিরে এসে বাড়িতে প্রবেশ করার আগে আগুনে হাত সেঁকে, নিমপাতা দাঁতে কেটে তবে বাড়িতে প্রবেশ করতে হয়। এ প্রথা চলে আসছে আচার-বিধি অনুসারে। বৈদিক সূত্রের একটি উপদেশ হলো, নিম অশুভ দূর করে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আছে, নিম এক প্রধান ভেষজ এবং সর্বরোগহর। নিমের হাওয়া বহু রোগের প্রতিষেধক। বিশেষত বাড়ির দক্ষিণদিকে নিমগাছ থাকা ভালো। এতে বাড়ির পরিবেশ শুদ্ধ রাখে।

বসন্তকালে আমাদের শরীরে প্রকৃতির নিয়মে রসাধিক্য ঘটে, আর অন্যসব ঋতুতে কম ঘটে। ফলে অনেক সময় এই সমস্ত রসবহ স্রোতের পথ অবরুদ্ধ হয়ে বহু রোগের সৃষ্টি হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক দ্রব্য হলো নিম। নিমের পাতা বসন্ত রোগীর বিছানায় ছড়িয়ে দিলে রোগের যন্ত্রণা শীঘ্রই কমে আসে। তাই বসন্তে নিমের এত প্রয়োজন। নিমের বিভিন্ন অংশ যেমন ফুল, বীজ, পাতা, ছাল ও কাঠ বিভিন্ন অনুপান সহযোগে অজীর্ণ, জন্ডিস, লিভারের ব্যথায়, ব্লাডসুগারে, রাতকানা, ফোঁড়ায়, বমি, চোখ ঝাপসায়, শুকনো কাশিতে, রক্তদৃষ্টি, ঘুষঘুষে জ্বর, ক্রিমি, অরুচি, মুখে বা মাড়িতে ঘা, মাথাধরা সর্দি-গর্মি, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, জন্ম নিরোধক, হাঁপানি, কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শ, পিত্তাধিক্য, জননেন্দ্রিয়র দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও চুলের অকালপক্কতারোধে নিমের বিশেষ গুণ রয়েছে। যেমন, মাঘ মাসের শেষের দিকে সাতটি নিমপাতা এবং সাতটি মুসুর ডাল একত্রে চিবিয়ে খেলে বসন্ত রোগ হয় না। আর যাঁদের ইউরিক অ্যাসিড আছে, তাঁরা কচি নিমপাতা কুড়িটা, একটা কাঁচাকলা একসঙ্গে সেদ্ধ করে একটু বেগুনপোড়ার সঙ্গে মিশিয়ে গরম ভাতে খেলে উপশম হবে। আর ব্লাড সুগারে দশটি নিমপাতা ও পাঁচটি গোলমরিচ সকালে খালি পেটে চিবিয়ে খেতে হয়। তবে এর সঙ্গে আহারের বিধিও মেনে চলতে হবে।

অসুখে নয়, সুখে থাকার সহজ উপায় সব ঋতুতেই নিমপাতা খাওয়া ভালো। শাস্ত্রমতে বিশ্বাস, ভক্তি, নিয়ম না মানলে শান্তি হয় না। বার, তিথি, সর্বতিথি না মেনে খাদ্য খেলে রোগব্যাধি বেশি হয়। দেশের মানুষ, সাবধান, সামনের দিন খুব ভয়ঙ্কর। কোনো অসুখই ভালো হতে চাইবে না সহজে অথবা ভালো হবে না মোটেই। সেজন্য রোগ হলে তখন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া অপেক্ষা যাতে রোগ হতে না পারে। তার প্রতিকারে সকালে খালি পেটে নিমপাতা খাওয়া। এটা যেকোনো মারণ রোগের প্রতিষেধক। রবিবার, শনিবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, বৈশাখ মাসে ও ষষ্ঠী তিথিতে নিমপাতা খাওয়া নিষেধ। কারণ নিমপাতার মধ্যে থাকে মার্গারিক অ্যাসিড, যা শরীরের সংক্রামক রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। কিন্তু বৈশাখ মাসে এই মার্গারিক অ্যাসিড সূর্যের তাপে পরিবর্তিত হয়ে যায় 'সানফেটে'-এ, যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। হজম করা শক্ত হয়ে পড়ে। আবার বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে নিমের স্বল্পমেয়াদি ব্যবহার ভালো। দীর্ঘ মেয়াদি নিমের ব্যবহার কিডনি ও লিভারের ক্ষতি করতে পারে। অনেক বিপত্তি ডেকে আনে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের প্রতি সপ্তাহে তিনদিন তিনটি কাঁচা নিমপাতা খেতে হয়। বৈশাখ মাসে নিমপাতা খাওয়া চলে না। আর অন্যান্য মাসের প্রতি সপ্তাহে একদিন তিনটি কাঁচা নিমপাতা খেতে হয়। আর যাদের পিত্ত-র ধাত আছে, তারা নিমপাতা অল্পমাত্রায় খাবেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে, প্রকৃতি অবশ্যই তার শোধ নেবে।

মশা নিধনে কেমিক্যাল ধূপ নয়, ধুনোর সঙ্গে নিমপাতা পোড়ালে বেশি কার্যকরী। মশার দংশন থেকে নিস্তার পাওয়া স্থায়ী ও ফলপ্রসূ উপায়। □

DURO
Innovating Since 1957

Duroply Industries Limited

High-performance plywood
since generations, for generations.

- First to manufacture and market plywood made from European Beech
- First to launch one-of-a-kind experience centre in New Delhi
- First to launch 10" range of plywood in India
- First to introduce lifetime guarantee against insect infestation on premium products
- First to introduce 9X safety under DURO Advantage

Duroply Industries Limited
Head Office: 113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata - 700016
Corporate Office: 1/35, W.H.S., Kirti Nagar, New Delhi - 110015 | **CIN:** L20211WB1957PLC023493
Toll Free: 1800-345-3876 | **Email:** enquiry@duroply.com | **Website:** www.duroply.in
Find us on: duroplyindia

Scan to know more

ত্রিপুরা

পাহাড় থেকে সাগর—রামময় পশ্চিমবঙ্গ

এবছর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো— 'শ্রীরামনবমী'। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিটি গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে প্রতিটি ওয়ার্ডে গঠিত হয় 'শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি'। এই সমিতিগুলির উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহ আয়োজিত হয় মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা। রাজ্য জুড়ে উদ্‌যাপিত এই কর্মসূচীর নামকরণ করা হয়— 'শ্রীরামমহোৎসব'। গত ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২ এপ্রিল (শ্রীহনুমান জয়ন্তী) পর্যন্ত রাজ্য ব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ৩ কোটি হিন্দু সনাতনী এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে। এ বছর শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে কলকাতা ও হাওড়া-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে ১৩৮টি বিশাল শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। এবছর বড়ো ও ছোটো মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রায় ৪ হাজার শোভাযাত্রা হয়। কলকাতায় ছোটো-বড়ো মিলিয়ে এই সংখ্যাটা প্রায়— ৭০।

গত ২৫ মার্চ নদীয়া জেলার শান্তিপুরের ফুলিয়ার চাঁপাতলায় 'শ্রীরাম পাঁচালী' পুঁথির প্রণেতা কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থানে ভব্য শ্রীরামমন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীকৃত্তিবাস রামমন্দির ট্রাস্টের উদ্যোগে এদিন বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচয়িতার পৈতৃক আবাসস্থলে 'ভূমি পূজন' ও 'শ্রীকৃত্তিবাস রামমন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠান' হয়। শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যা ধাম থেকে আগত পবিত্র মৃত্তিকা ও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র চরণপাদুকা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ৬০০ বছরের ঐতিহ্যের স্মরণে মহাকবি শ্রীকৃত্তিবাস ওঝার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীকৃত্তিবাস রামমন্দির ট্রাস্টের সভাপতি অরিন্দম ভট্টাচার্য। শ্রীরামমন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এদিন ১০৮ জন পুরোহিতের পরিচালনায় সংঘটিত হয় হোমযজ্ঞ। পূজা ও যজ্ঞ সমাপ্ত হলে এই তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত প্রায় ১০ হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ২৬ মার্চ শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে ভবানীপুরে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। খোল করতাল, কীর্তন, জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হয় গোটা এলাকা। এদিন যদুবাবুর বাজার থেকে শুরু হয় শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রা। শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে তাঁর একাধিক কর্মসূচিতে যোগদানের কথা থাকলেও তিনি প্রথমেই ভবানীপুরে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রা চলাকালীন তিনি মন্দিরে পূজা দেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। সাধুসন্তরাও এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন শ্রীরামনবমীর পূজা ঘিরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এদিন যাদবপুরের পাশাপাশি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও উদ্‌যাপিত হয় শ্রীরামনবমী। তবে ধর্মীয় আচার পালনের সময় বাম ও অতিবামপন্থীদের স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এদিন সকাল থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শ্রীরামনবমীর পূজাকে কেন্দ্র করে জড়ো হন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্য-সদস্যারা। তাঁদের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে দু'জায়গায় পূজার আয়োজন করা হয়— ত্রিগুণা সেন সভাঘরের উল্টো দিকে এবং

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নকশালবাড়ি

প্রযুক্তি ভবনের নীচে। এরপর পূজা ঘিরে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পূজা চলাকালীন সেখানে এসে জড়ো হয় বাম ও অতিবাম মনোভাবাপন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। শুরু করে স্লোগান। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে এদিন চাপা পড়ে যায় বামপন্থীদের বাগাড়ম্বর। বামপন্থীরা পূজাস্থল আক্রমণ করার পরিস্থিতি তৈরি করলে হস্তক্ষেপ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিদ্যার্থী পরিষদ জানায় যে, পূজার জন্য মৌখিক অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। সংগঠনের যাদবপুর ইউনিটের সভাপতি নিখিল দাস জানান যে, কিছু অতিবাম ছাত্র ইচ্ছাকৃতভাবে এদিন গোলমাল করতে আসে। তবে উপাচার্য পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা নির্বিঘ্নেই বিকেল পর্যন্ত চলেছে।' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছিল প্রায় একই চিত্র। কর্তৃপক্ষ অনুমতিদানে অস্বীকৃত হওয়ায় কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের মূল ফটকের বাইরে শ্রীরামনবমীর পূজা করেন বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্য-সদস্যারা। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য-সহ পরিষদের অন্যান্য কার্যকর্তারা। কলকাতার বুকে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রশাসনিক অনুমতির অস্পষ্টতার মধ্যেই রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে শ্রীরামনবমীর পূজা সম্পন্ন করে বিদ্যার্থী পরিষদ।

প্রতি বছরের মতো এবছরও গত ২৬ মার্চ 'শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি'র উদ্যোগে পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটায় এক বিশাল, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। এদিন সকালে বেলেঘাটায় বরফ কল মোড়ে উপস্থিত হন অগণিত রামভক্ত। সন্ন্যাসীদের পূজাপাঠের মাধ্যমে এদিনের কার্যক্রমের সূচনা হয়। পূজার পর শুরু হয় শ্রীরামনবমীর ধর্মীয় শোভাযাত্রা। অগ্রভাগে অটো প্রচার, তারপর মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতি সংবলিত, সুসজ্জিত ট্যাবলো, মাতৃশক্তির দ্বারা ঢাক বাদ্য, এর পিছনে সন্ন্যাসী, মাতৃশক্তি ও পুরুষদের পথ সঞ্চলন, মোটরবাইক র‍্যালি এবং শেষ প্রান্তে ডিজে বাদ্য— এই নিয়েই ছিল সমগ্র শোভাযাত্রা। বেলেঘাটা বরফ কল মোড় থেকে শুরু হয়ে সমগ্র বেলেঘাটা মেন রোড পরিক্রমা করে সিআইটি বিল্ডিং মোড়ে পৌঁছে শোভাযাত্রাটি সমাপ্ত হয়। শোভাযাত্রাটি প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন অনেক বিশিষ্টজন। শোভাযাত্রা চলাকালীন রাস্তার দু'ধারে মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। পথ পরিক্রমা শেষে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল স্বল্পাহারের ব্যবস্থা। সমগ্র কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনায় ছিল 'বেলেঘাটা নাগরিক সমাজ'।

গত ২৭ মার্চ শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে বজবজের সত্যপীরতলা থেকে সাতগাছিয়া বিধানসভার বিদ্যানগর মঠ পর্যন্ত একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। হাজার হাজার সনাতনী মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বাখরাহাট শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে এবং গঙ্গাসাগর জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগিতায় এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর শ্রীরামচন্দ্রের পূজা এবং ধর্মীয় শোভাযাত্রা দশম বর্ষে পদার্পণ করল। মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, মা সীতা, রামানুজ লক্ষ্মণ এবং শ্রীবজরঙ্গবলীর মূর্তি সহকারে শোভাযাত্রা শুরু হয়। গৈরিক ধ্বজ এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে শোভাযাত্রা মুখরিত হয়ে ওঠে। ২৭ মার্চ আসানসোল (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের বার্নপুরে রাধানগর রোডে যুব সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে হওয়া শ্রীরামনবমীর পূজায় অংশগ্রহণ করেন অগ্নিমিত্রা পাল। পরে তিনি আসানসোলে ফতেপুরে শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন শিলিগুড়ি, ঈশ্বরপুর, খড়্গপুর, ডেবরা, শান্তিপুর, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, কাকদ্বীপ, গাইঘাটা, ঠাকুরনগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় শ্রীরামনবমী। শিলিগুড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ড. শঙ্কর ঘোষ।

গত ২৭ মার্চ মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে মুকুন্দবাগ অঞ্চলের বেণীপুর গ্রামে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক বিরাট শোভাযাত্রা। এছাড়াও এবারের শ্রীরামনবমীতে বনগাঁর আমলাপাড়া চৌমাথা মোড়ে এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে। রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হলেও সেই রাজনৈতিক চাপের সামনে নতিস্বীকার করেননি উদ্যোক্তারা। খোলা মঞ্চ বা প্যান্ডেল না করে, ভাড়া করা গাড়ির মধ্যেই সম্পন্ন হয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা। নদীয়া জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবছরও শ্রীরামনবমী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পক্ষ থেকে চাঁদমারি থেকে ভীমপুর পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। পরে

মালদা

গাজোল

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

বসিরহাট

ভীমপুর থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভবনের উদ্দেশে শোভাযাত্রাটি যায়। এই বছরে পরিষদ ও বজরঙ্গ দল আয়োজিত উৎসব বেশ জমজমাট রূপ পরিগ্রহ করে। পুরুলিয়া জেলার পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভেলাটাঁড় গ্রামে আয়োজিত হয় শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় পাথর ছোঁড়ে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। এ ঘটনায় পুলিশ হামলাকারীদের না ধরে উল্টে আক্রান্তদের ওপরেই লাঠিচার্জ করে। খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছান সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো এবং পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নদীয়ারচাঁদ বাউরি-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। এদিন ভেলাটাঁড় গ্রামের রাস্তায় শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সেই সময় কিছু দুষ্কৃতী দূর থেকে ইটের টুকরো ছুঁড়তে থাকে। আচমকা এই ঘটনায় ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওই পরিস্থিতির মধ্যেই দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করতে পাল্টা ধাওয়া করেন শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া সনাতনীরা। ইটের টুকরোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শোভাযাত্রার ট্যাবলোর গাড়ি। সামনের কাঁচ ভেঙে যায়। এদিন মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণ চালায় জেহাদিরা। স্থানীয় ফুলতলা মোড়ে শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাতেই জেহাদিরা পাথরবৃষ্টি করতে থাকে। অসংখ্য সনাতনী আহত হন। সনাতনীদের দোকানঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে জেহাদিরা। বীরভূম জেলার নলহাটিতে শ্রীরামনবমী শোভাযাত্রায় সনাতনীদের ওপর পুলিশি জুলুমের অভিযোগ ওঠে।

গত ২৫ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ব্যারাকপুর মহকুমার ভাটপাড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (কাঁকিনাড়া প্রখণ্ড)-এর উদ্যোগে কাঁকিনাড়ায় ফলাহারী বাবা মন্দিরে আয়োজিত হয় শ্রীরাম পূজন মহোৎসব। এরপর ২৭ মার্চ এই সংগঠনের পরিচালনায় আয়োজিত হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আর্যসমাজ মোড় থেকে শুরু হয়ে মাদ্রাল-স্থিত শ্রীহনুমান মন্দিরে পৌঁছে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। এদিনের শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ভোলা গিরি আশ্রমের সন্ন্যাসী ধ্যানব্রতানন্দ গিরি মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস, ধর্ম জাগরণ সমন্বয় সমিতি (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সহ-নিধি প্রমুখ সমীররঞ্জন ঘোষ, জেলা কার্যবাহ ইন্দ্রনাথ রায়, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত টোলীর সদস্য রোহিত সাউ প্রমুখ বিশিষ্টজন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন পূজ্য সাধুসন্ত-সহ কাঁকিনাড়া প্রখণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল, মাতৃশক্তি, দুর্গাবাহিনীর সকল কার্যকর্তা ও কার্যকর্ত্রী এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ।

একই দিনে বসিরহাটে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী মানিকচন্দ্র পাল ও পরিষদের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ধর্মাচার্য সম্পর্ক সংযোজক শম্ভু কুণ্ডু। গত ২৭ মার্চ বাঁকুড়া-১নং ব্লকে 'আন্ধারথোল গ্রাম উদ্‌যাপন সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত হয়--- 'শ্রীরামনবমী উৎসব'। ঘটসহকারে ধর্মীয় শোভাযাত্রা, পূজার্চনা, মহাযজ্ঞ প্রসাদ বিতরণ ও রামায়ণ চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে এদিন আন্ধারথোল গ্রামে শ্রীরামনবমী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

গত ২৭ মার্চ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তর কলকাতা জেলা ও শ্রীরামনবমী উৎসব উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয় শ্রীরামনবমী উৎসব ও শোভাযাত্রা। এদিন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কাশীপুর লালাবাবু লেন পর্যন্ত শোভাযাত্রাটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় উপস্থিত অগণিত রামভক্ত ও সনাতনী হিন্দুদের উচ্চারিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস।

গত ২৭ মার্চ দক্ষিণ কলকাতায় 'শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি'র উদ্যোগে চারটি স্থান থেকে শুরু হয় শ্রীরামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। চারটি পৃথক স্থান থেকে শুরু হয়ে চারটি শোভাযাত্রারই মিলনস্থল ছিল— সুলেখা মোড়। ৫ ও ৬ নং বাসস্ট্যান্ডের মাঝে গড়িয়া মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রথম শোভাযাত্রাটি গাঙ্গুলিবাগান, বাঘা যতীন মোড় হয়ে সুলেখা মোড়ে পৌঁছায়। টালিগঞ্জ দমকল কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড ও লর্ডস্ মোড়, যাদবপুর থানা ও যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড

বালুরঘাট

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হয়ে দ্বিতীয় শোভাযাত্রাটি সুলেখা মোড়ে পৌঁছায়। তৃতীয় শোভাযাত্রাটি নেতাজীনগর-স্থিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে গান্ধী কলোনি, শ্রী কলোনি, বাঘা যতীন মোড় হয়ে সুলেখা মোড়ে পৌঁছায়। মুকুন্দপুর বাজার থেকে শুরু হয়ে অজয়নগর মোড়, সন্তোষপুর লেক, সন্তোষপুর রোড ও বড়তলা বাজার হয়ে চতুর্থ শোভাযাত্রাটি সুলেখা মোড়ে পৌঁছায়। এছাড়াও এদিন দক্ষিণ কলকাতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দেশপ্রিয় ভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, রাসবিহারী অঞ্চল-সহ মোট ১৮টি বসতির মধ্য দিয়ে এদিন শোভাযাত্রাটি পথ পরিক্রমা করে। স্বয়ংসেবক, বালক, বিদ্যার্থী, মাতৃশক্তি-সহ প্রায় ৬২৫ জন এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ড. স্বপন দাশগুপ্ত এদিনের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন 'শ্রীশ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি, মধ্য কলকাতা'র উদ্যোগে আয়োজিত হয় একটি 'বিরাট শোভাযাত্রা'। মধ্য কলকাতার হিন্দ সিনেমার অনতিদূর থেকে শুরু হয়ে বৌবাজার, কলেজ স্ট্রিট-সহ দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে ঠনঠনিয়ায় শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের নিকটে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট-স্থিত শ্রীরামমন্দিরে পৌঁছে শোভাযাত্রাটি সমাপ্ত হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী, সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, সংস্কার ভারতীর বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডু, পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ)-এর

হলদিবাড়ি

সভাপতি কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য, জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা প্রমুখ বিশিষ্টজন। শোভাযাত্রা থেকে মুহুর্মুহু উচ্চারিত 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে সম্পূর্ণ মধ্য কলকাতার পরিবেশ এদিন রামময় হয়ে ওঠে।

প্রতি বছরের মতো এবারেও 'উত্তর দমদম নগর সচেতন সনাতনী হিন্দু সমাজ'-এর পরিচালনায় গত ২৬ মার্চ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পুণ্য তিথিতে শ্রীরামনবমী মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের বিশেষ আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল এক বিশাল, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, যা নিমতা ২০১ নং বাসস্ট্যান্ড থেকে বিরাটি অভিমুখে মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় রোড ধরে মহাজাতি নগরে শ্রীহনুমান মন্দির পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। বিভিন্ন মঠ, মন্দির, মিশনের সাধুসন্ত, ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং সমাজের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থেকে এই শোভাযাত্রাকে অত্যন্ত বর্ণময় করে তোলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বহু প্রবীণ ও নবীন স্বয়ংসেবক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রখণ্ড সম্পাদক-সহ অন্যান্য কার্যকর্তা এবং বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষের উপস্থিতি এই শোভাযাত্রাকে এক বিশেষ মাত্রা দান করে। এছাড়া উত্তর দমদম নগর সচেতন সনাতনী হিন্দু সমাজের অগণিত কর্মী, সদস্য ও সদস্যা-সহ সংগঠনের সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষক পরিমলেন্দু বিকাশ রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী রাকেশ কীর্তনিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবল দত্ত, গোপাল গুহ মজুমদার, তপন দাস, প্রবীর নাগ ও প্রশান্ত বিশ্বাস এই মহতী শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

With Best Compliments From -

শতবর্ষের আলোকে সঙ্ঘ

KOTILYA CONSULTANTS LIMITED

Registered Office
1st Floor, B. K. Market
16B, Shakespeare Sarani
Kolkata - 700 071

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

বাংলা বারো মাসের নামমাহাত্ম্য

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বিশ্বজনীনতা

'নামের আমি, নামের তুমি, নাম দিয়ে যায় চেনা'— এভাবেও শুরু করা যায়। প্রত্যহ যে দিন অথবা মাসের কথা আমরা উচ্চারণ করি নানা প্রসঙ্গে, ভুলেও কখনো মনে পড়ে না কেন ওদের ওই নামেই ডাকা হয়? অন্য কোনো নামও তো হতে পারত ওই দিন, এই মাসগুলির! আর তা নাই-বা হলো, কিন্তু যা হয়েছে— তাই-বা কেন, অথবা কীভাবে, তা ভাবি না কেউ প্রায় কোনো সময়ই। অথবা ভাবার কথা হয়তো মনেও আসে না। কিংবা মনে হয়, অমনই তো হওয়ার কথা ছিল বা ওটাই তো এগুলির নাম, তাই ওসব নিয়ে ভাবার কি কিছু আছে? প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই আছে। এ জগতে যা কিছু আছে, তা তার যে নামেই হোক, প্রতিটির পেছনেই রয়েছে কোনো না কোনো বিশেষ ভাবনা অথবা কারণ। আর সে সবের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক বা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস। তাই একবার বরং ওই দিন-মাসের নামাবলী নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বাংলা দিন অথবা মাসের নামকরণের বিষয় নিয়ে কিছু বলার আগে একবার ইংরেজি মাস ও দিনের নামের দিকে তাকানো যাক। দেখা যাক, ওইসব নামের সঙ্গে বাংলা মাস ও দিনের কোনো সাদৃশ্য আছে কিনা? দেখা যাক, এসবের পেছনে একই রকম চিন্তাভাবনা কাজ করছে কিনা? দেশ, কাল অথবা ভাষা যাইহোক, মনুষ্য নামক প্রজাতির ভাবনা, চিন্তা, অনুভব বা তার প্রকাশ ভঙ্গিমার প্রাথমিক রূপটি তো একই থাকার কথা। হয়তো সেই সত্যর মুখোমুখি হয়ে এক ধরনের বিশ্ব-মানবিকতার শরিক হওয়া যাবে।

খ্রিস্টাব্দের বারো মাস

বাংলা বছর বা বঙ্গাব্দের মতোই ইংরেজি বছর বা খ্রিস্টাব্দের উইকও গঠিত সাতদিনেই। তাই ইংরেজি মাস ও সাতদিনের নাম নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

ইংরেজি দিনগুলির নাম চিহ্নিত হয়েছে প্রাচীন রোমান জ্যোতির্বিজ্ঞান, জার্মান ও নর্স (Norse) পুরাণের দেবতাদের নামের মিশ্রণে। প্রাথমিক স্তরে রোমানরা সপ্তাহের দিনগুলির নাম দিয়েছিল লাতিনে। কিন্তু পরবর্তীকালে অ্যাংলো স্যাকসনরা সেগুলি তাদের নিজস্ব দেব-দেবীর নামে রূপান্তরিত করে। আর তার থেকেই এসেছে আজকের ইংরেজি বারগুলির নাম।

বাংলা বা ভারতীয় ধারার মতোই ইংরেজি সপ্তাহের প্রথম দিনটিও রবিবার বা সানডে। এই নামটি নেওয়া হয়েছে সূর্যদেবতা বা সানগড থেকে।

Moon's day বা Monday, বাংলায় যার নাম সোমবার, সেটি এসেছে চন্দ্র (Moon) বা চন্দ্রদেবতাকে (Moongod) থেকে। প্রাচীন ইংরেজিতে দিনটিকে Monandaeg বা চাঁদের দিন বলা হতো।

নর্স পুরাণের অন্যতম যুদ্ধদেবতা টিউ (Tiw তথা Tyr)-এর নাম থেকে Tiw'sday বা Tuesday নামটি এসেছে। বাংলায় মঙ্গলবার দিনটির উৎস হিসেবে রোমান যুদ্ধদেবতা মার্স (Mers)-এর কথাও বলা হয়।

নর্স পুরাণেরই অন্যতম প্রধান দেবতা Woden (বা Odin)-এর নামটি বহন করছে Wednesday বা বুধবার। জার্মান দেবতা Woden-এর নাম অনুসারে এটি Woden's day বা 'ওডেনের দিন' নামে খ্যাত দিনটি লাতিন Mercury-এর নাম থেকে এসেছে Thor's day বা Thursday, বাংলায় বৃহস্পতিবার।

Frigg'sday থেকে এসেছে Friday বা শুক্রবার। নর্স পুরাণের প্রেমের দেবী Frigg (Frieyja) হলো এই নামের উৎস। শুক্রবারকে নর্স পুরাণে Friggjarstjama বলা হয়েছে। আর তার থেকে Friday নামটি এসেছে।

রোমান দেবতা স্যাটার্ন (Saturn) হলো Saturday বা শনিবারের উৎস। রোমান পুরাণকথায় স্যাটার্ন হলো কৃষি ও সময়ের দেবতা।

মাসও দেবতার নামেই

ইংরেজি বারের মতো মাসের নামের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে রোমান গড, এম্পারার ও নাম্বার। বিভিন্ন মাসের মূল উৎস সূচনা, শুদ্ধীকরণ অনুষ্ঠান ইত্যাদির দেবতা জানুস, যুদ্ধের দেবতা মার্স, মায়া/জুনোর মতো বসন্তের দেবী, রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার ও প্রথম রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজার এবং Septum, Octo, Decem ইত্যাদি লাতিন সংখ্যা।

রোমান পুরাণে, সূচনার দেবতা হলেন জানুস। অবশ্য সমাপ্তি, দ্বার ও পরিবর্তনের দেবতাও এই জানুস। আর তার থেকেই ইংরেজি ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসের নাম রাখা হয়েছে জানুয়ারি।

রোমের একটি শুদ্ধীকরণ উৎসবকে লাতিনে বলা হয় Februare বা Febura এবং তার থেকেই ইংরেজি দ্বিতীয় মাসের নাম হয়েছে

ফেব্রুয়ারি।

রোমানে যুদ্ধের দেবতার নাম মার্স এবং সেই নাম থেকে ইংরেজি তৃতীয় মাসের নাম মার্চ। ঐতিহাসিক ভাবে প্রাচীন রোমে এই সময়ই শুধু হতো যুদ্ধঅভিযান।

লাতিন শব্দ aperire-এর অর্থ হলো উন্মোচন বা প্রকাশ। ওই সময়ই আসে বসন্ত। প্রকৃতি সেজে ওঠে ফুলে ফুলে। বসন্তের ওই লাতিন শব্দ asperire থেকেই উদ্ভব এপ্রিল মাসের।

রোমান দেবী মায়া হলেন বৃদ্ধি ও প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী। এবং তার থেকেই ইংরেজি পঞ্চম মাসের নাম হয়েছে মে (May)।

বিবাহ, সন্তান ও প্রসবের রোমান দেবী জুনো থেকেই এসেছে ষষ্ঠ মাস জুন-এর নাম।

রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টস সিজারের নামেই রাখা হয়েছে অষ্টম মাস আগস্টের নাম।

লাতিন সংখ্যা Septum (Seven) octo (eight) Noven (nine) এবং Decem (Ten) থেকে এসেছে যথাক্রমে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর। পুরনো রোমান ক্যালেন্ডারে এগুলি ছিল সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম মাস। পরবর্তীকালে গ্রেগেরিয়ান ক্যালেন্ডারে এগুলি যথাক্রমে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাস হলেও নামের ক্ষেত্রে প্রাচীন রোমান নামগুলিই রেখে দেওয়া হয়।

এসব হলো ইংরেজি বার ও মাসের নামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবার তাকানো যাক বাংলা বছর বা বঙ্গাব্দের মাস ও বারের নামের ইতিহাসের দিকে। অবশ্য তারও আগে জেনে নেওয়া যাক আরও কয়েকটি বিষয়।

বঙ্গাব্দের কথা

কেবল বঙ্গ নয়, ভারতের দুর্ভাগ্য যে, দেশটি প্রায় আড়াই শো বছর ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন। ওই সময়কালে দেশ কেবল স্বশাসন বা স্বাধীনতার অধিকারই হারায়নি, একই সঙ্গে সারাদেশে চলেছিল সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য হরণেরও এক কদর্য চক্রান্ত। মৃদু-বিষায়ন বা স্লোপয়জেনের সেই ক্রিয়ায় আজও অবশ্য আমাদের চিন্তা ও মননশীলতা অনেকটাই বিকৃত। সে কারণেই অন্যান্য অনেক কিছুর মতো আমাদের জীবন থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে বঙ্গের বর্ষগণনার বিষয়টিও। প্রত্যহের তো বটেই, রাষ্ট্রীয় জীবনেও আজ বস্তুত ইংরেজি বর্ষগণনা বা খ্রিস্টাব্দেরই দাপট। সবচেয়ে মর্মান্তিক, আমরা এখন বাংলা সব তারিখের কথা স্মরণে না রেখে বা বলতে না পেরে এক অদ্ভুত শ্লাঘা বোধ করি। একই সঙ্গে যা ছিল একান্তই আমাদের ধন, তাকেও কোনো-না-কোনো ভাবে বিদেশি বা বহিরাগত সংস্কৃতির দান বলে উচ্চকিত হই। এক ধরনের আত্মপ্রসাদও লাভ করি।

মনে হবে, এ যেন ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত গাওয়া। তাই বাদ যাক ওই প্রসঙ্গ। বরং একবার ভারতীয় ও বঙ্গীয় বর্ষগণনা বা অব্দের বিষয়টি একবার ঝাকিয়ে নেওয়া যাক।

প্রাচীন ভারতীয় বর্ষগণনার ইতিহাসে যেসব অব্দের কথা আছে তার মধ্যে এখনো প্রাধান্য পেয়ে আসছে শকাব্দ বা শক সম্বৎ (সরকারি জাতীয় বর্ষপঞ্জি) এবং বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সম্বৎ (বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে)। জাতীয় বর্ষপঞ্জি শুরু পয়লা চৈত্র থেকে। সাধারণভাবে খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮ বছর বিয়োগ করলে শকাব্দ বা শকসম্বৎ পাওয়া যায়। একই ভাবে খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে ৫৭ বছর যোগ করলে বিক্রম সম্বৎ, বা বিক্রমাব্দ পাওয়া যায়। সেই হিসেবে চলতি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮ বছর বাদ দিলে বর্তমান শকাব্দ হবে ১৯৪৮ এবং ৫৭ বছর যোগ করলে বিক্রমাব্দ হবে ২০৮৩। অর্থাৎ শকাব্দের শুরু হয়েছিল মোটামুটি ৭৮ খ্রিস্টাব্দে, অন্যদিকে বিক্রম সম্বত চালু হয় খ্রিস্টাব্দ শুরুর ৫৭ বছর আগে। বিক্রম সম্বত বয়সের দিক থেকে খ্রিস্টাব্দের চেয়েও বড়ো বা প্রাচীন।

এবার আসা যাক বঙ্গাব্দর কথায়। বয়সের দিক থেকে বঙ্গাব্দ খ্রিস্টাব্দের চেয়ে ৫৯৩/৯৪ বছরের ছোটো। অর্থাৎ বঙ্গাব্দ সম্ভবত শুরু হয় ৫৯৩/৯৪ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানের একদল ঐতিহাসিক ভারত ভাগের ফলে সৃষ্ট পূর্বপাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পুরো ব্যাপারটা একটি ইসলামীকরণ শুরু করে দেয়। তারপর থেকেই দাবি করা হতে থাকে মুঘল বাদশাহ আকবর ১৫৫৬ ক্রিস্টাব্দে বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, মুঘল আমলে প্রচলিত হিজরি সন অনুযায়ী খাজনা আদায় করতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। চান্দ্র বছরের কারণে হিজরি সন এক থেকে অন্য ঋতুতে সরে যায়। কিন্তু ফসল কাটার সময়টা একই থাকে। এরকম অবস্থায় কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়। সেই কারণে আকবর চান্দ্র পঞ্জিকার হিজরি সনের সঙ্গে ভারতের সৌর পঞ্জিকার সমন্বয় ঘটিয়ে তারিখ-ই-ইলাহি চালু করেন ১৫৮৪/৮৫ খ্রিস্টাব্দে। সেটাই যদি হয় তাহলে আকবর আবার তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বঙ্গাব্দ চালু করবেন কেন? তাছাড়া আকবর ছিলেন ভারত বাদশা। হিজরি সনের ভিত্তিতে খাজনা আদায় ছিল একটি সর্বভারতীয় সমস্যা। সেক্ষেত্রে তিনি কেন কেবল সুবে বাঙ্গালার জন্য একটি আলাদা অব্দের প্রবর্তন করবেন? এর কোনো সদুত্তর নেই।

অন্যদিকে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন বঙ্গ তথা গৌড়ের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট শশাঙ্কই ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময়কে মহিমময় করতেই সৌরবছর বঙ্গব্দের প্রবর্তন করেন। হয়তো আকবর কাজের সুবিধার জন্য শশাঙ্ক প্রবর্তিত ওই অব্দটি ব্যবহার করে এটিকে জনপ্রিয় করেন। তথ্য হিসেবে এই যুক্তিটিই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। অতএব, অযথা ভারত ঐতিহ্য নস্যাৎ করার কুযুক্তির অবতারণা না করাই ভালো।

চান্দ্র বছরের নিয়মেই

খ্রিস্টাব্দের মতোই বঙ্গাব্দও একটি সৌরবছর। কিন্তু বঙ্গাব্দের বৈশিষ্ট্য, এই অব্দের বারোটি মাসের নামকরণের ব্যাপারে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে চান্দ্র বছরের নিয়মনীতিগুলি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীন গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত'-র সূত্র, 'নক্ষত্রনাম্না মাসাস্তু জ্ঞেয়াঃ পর্বান্তযোগতঃ' অর্থাৎ পূর্ণিমার শেষ সাধারণত যে যে নক্ষত্রে হয়, মাসের নাম হয় সেই নক্ষত্রের নামে।

চান্দ্র মাস গণনা করা হয় শুক্লা কিংবা কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা বা অমাবস্যা শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই পক্ষকালের সময়কে নিয়ে। এই ভাবে এক একটি মাসের দিন সংখ্যা হয় কম-বেশি ত্রিশ দিন। আর তাতে একটি চান্দ্র বছরের দিন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৫। অর্থাৎ একটি সৌরবছরের (৩৬৫ দিন) থেকে চান্দ্র বছরের দিন সংখ্যা দশদিন কম। এইভাবে তিন বছরে কম হয় মোট ৩০ দিন। এই ঘাটতি মেটানোর তথা সৌর ও চান্দ্র বছরের সমন্বয় করার জন্য হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী চতুর্থ বছরে যুক্ত হয় একটি অতিরিক্ত মাস। এই অতিরিক্ত মাসটিই হলো মলমাস। শাস্ত্র অনুযায়ী মলমাসে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যায় না।

এর থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে চান্দ্র বছরই প্রচলিত ছিল। সেই ধারাতেই সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে যে বারোটি নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হয়

এবং সেই বারোটি নক্ষত্রের নামেই চিহ্নিত হয়েছে বারোটি মাস সুপ্রাচীনকাল থেকে।

পৌরাণিক কাহিনি, প্রজাপতি দক্ষ ও প্রসূতির সাতাশটি কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল চন্দ্রের। আর দক্ষ ও প্রসূতির ছোটো মেয়ে সতীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেবের। চন্দ্রের সঙ্গে দক্ষের যে ২৭টি কন্যার বিয়ে হয় তারাই এক একটি নক্ষত্র। বিয়ের পর পারিবারিক সংকট যাতে না হয় তার জন্য চন্দ্র এক এক স্ত্রী বা নক্ষত্রের ঘরে একদিন করে কাটান। এইভাবে ২৭টি নক্ষত্রে ২৭ দিন কাটবার পর চন্দ্র বাকি তিনদিন বিশ্রাম করেন।

নক্ষত্রের নামে মাস

চন্দ্রের ২৭ জন স্ত্রী তথা নক্ষত্রের নাম হলো, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভদ্রা, উত্তরভদ্রা ও রেবতী।

চান্দ্র মাসে সাতাশটি নক্ষত্রের চন্দ্রের অবস্থানের ধারায় যে মাসে বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমা শেষ হয় সেই মাসের নাম হয় বৈশাখ।

এইভাবে যে চান্দ্রমাসে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হয় সে মাসের নাম হয় জ্যৈষ্ঠ। যখন পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে পড়ে পূর্ণিমা, সেই মাসটির নাম হয় আষাঢ়। শ্রবণানক্ষত্রে পূর্ণিমা হলে নাম হয় শ্রাবণ। পূর্বভদ্রায় পূর্ণিমান্ত হওয়ায় সেই মাসটির নাম হয় ভাদ্র। এই ধারাতে অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, চিত্রা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হলে সেই মাসগুলির নাম হয় যথাক্রমে আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

পৌরাণিক কাহিনি, দেবমাতা অদিতির বারো জন পুত্র তথা দ্বাদশ আদিত্যর এক একজন এক একটি মাসের অধিপতি।

বারোটি মাসের অধিপতি বারোজন আদিত্যর মধ্যে অর্যমা হলেন বৈশাখের অধিপতি। একইভাবে পরবর্তী মাসগুলির অধিপতিরা হলেন যথাক্রমে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান, ত্বষ্টা, বিষ্ণু, অংশুমান, ভগ, পুষা, শার্জন্য ও ধাতা। অবশ্য কোনো কোনো পুরাণে এই আদিত্যদের অধিকারভুক্ত নামের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে।

দেবতারা সর্বব্যাপী। সব মাস বা বছরেই রয়েছে সব দেবতার সমান অবস্থান। তবুও এক একটি মাসে রয়েছে এক একজন দেবতার বিশেষ অবস্থান। এইভাবে বৈশাখে বিষ্ণু ও গণেশ, জ্যৈষ্ঠে মা ষষ্ঠী, কালী; আষাঢ়ে জগন্নাথদেবের রথ; শ্রাবণে শিব; আশ্বিনে দুর্গা; কার্তিকে কোজাগরী লক্ষ্মী ও কার্তিক; অগ্রহায়ণে লক্ষ্মী নারায়ণ; পৌষে লক্ষ্মী ও সূর্য; মাঘে সরস্বতী; ফাল্গুনে শ্রীকৃষ্ণ ও শিব; চৈত্রে শিব, বাসন্তী ও অন্নপূর্ণার বিশেষ অধিকার।

কিছু পুরাণ মতে, বৈশাখ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নামে, জ্ঞানের দেবতা বিষ্ণুর নামে জ্যৈষ্ঠ, শক্তির দেবতা শিবের নামে আষাঢ়, সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর নামে শ্রাবণ, দেবী দুর্গার নামে ভাদ্র, আলোর দেবতা ইন্দ্রর নামে আশ্বিন, সাহসের দেবতা কার্তিকের নামে কার্তিক, অগ্নির নামে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ ও মাঘের দেবতা যথাক্রমে অন্নপূর্ণা ও আকাশের নামে চিহ্নিত।

বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যে আবার প্রতিটি মাস চিহ্নিত বিষ্ণুর এক একটি রূপের নামে এবং সেই মাসে বিষ্ণুকে ওই রূপেই পূজার বিধান রয়েছে। সেই বিধান অনুযায়ী বৈশাখের নাম কেশব, জ্যৈষ্ঠের নাম নারায়ণ, আষাঢ়ের মাধব, শ্রাবণের গোবিন্দ, ভাদ্রের বিষ্ণু, আশ্বিনের মধুসূদন, কার্তিকের ত্রিবিক্রম, অগ্রহায়ণের বামন, পৌষের শ্রীধর, মাঘের হৃষীকেশ, ফাল্গুনের পদ্মনাভ এবং চৈত্রে বিষ্ণুর অবস্থান দামোদর রূপে।

বাংলা মাসের নামকরণ রয়েছে বৈদিক ঐতিহ্য ও ভাবনা। স্বভাবতই বৈদিক সাহিত্যে রয়ে গেছে ওই নামগুলির উৎস। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের ভিত্তিতেই সেযুগে মাসগুলি যে নামে পরিচিত, বর্তমানের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বৈদিক বর্ষপঞ্জীতে উল্লেখিত বারোটি মাসের নাম মধু (চৈত্র), সইষ (আশ্বিন), উর্জ (কার্তিক), সহ মাধব (বৈশাখ), শুক্র (জ্যৈষ্ঠ), শুচি (আষাঢ়), নভ (শ্রাবণ), নভস্য (ভাদ্র), (অগ্রহায়ণ), সহস্য (পৌষ), তপ (মাঘ) এবং তপস্য হলো ফাল্গুন মাসের নাম।

এখনকার মতোই বেদের যুগেও ছিল ছ'টি ঋতু। প্রতিটি ঋতুর সময়কাল দু'মাস। সেই হিসেবে মধু ও মাধব— বসন্তকাল; শুক্র ও সুচি গ্রীষ্ম, নভ ও নভস্য— বর্ষা, ইষ ও উর্জ-শরৎ, সহস ও সহস্য— হেমন্ত এবং তপ ও তপস্য হলো শিশির বা শীতকাল।

বাংলা মাসের পরেই চলে আসে বাংলা বারের নামের কথা। ইংরেজি বারের নামের মতোই বাংলাতেও বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহের নামেই চিহ্নিত এক-একটি বার। অবশ্য এই গ্রহগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা দেবতার কাহিনি। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি বিভিন্ন বারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এবার দৃষ্টিপাত সেই বারের নামে।

নবগ্রহ থেকেই বার

ইংরেজি Week-এর মতোই সপ্তাহও গঠিত সপ্ত অহ বা সাত দিনে। বর্তমানে দিনগুলির নামের সঙ্গে যুক্ত 'বার' শব্দটি। কিন্তু অতীতে 'বার'-এর পরিবর্তে 'বাসর' শব্দটি যুক্ত থাকত। তাছাড়া বর্তমানে দিনগুলি যে যে নামে পরিচিত অতীতে একই নামে প্রতি শব্দেও দিনগুলি পরিচিত ছিল। যেমন রবিবারকে কখনো বলা হয়েছে আদিত্যবার, ভানুবাসর। একইভাবে সোমবার হয়েছে ইন্দুবাসর, মঙ্গলবার— ভৌমবাসর, বুধবার সৌম্যবাসর বৃহস্পতিবার গুরু বাসর, শুক্রবার ভৃগুবাসর এবং শনিবার হয়েছে স্থিরবাসর।

প্রাথমিক ভাবে নবগ্রহ হলো বাংলা বারের নামের উৎস মূর্খ এবং সেটি একটি নক্ষত্র। একইভাবে সোমবারের উৎসে রয়েছে যে চন্দ্র তা হলো পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। বাকি পাঁচটিবারই এক একটি গ্রহের নামে চিহ্নিত। প্রাচীন রীতিতে বার বলতে ব্যবহার করা হতো 'বাসর' শব্দটি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কারণে 'রবিবাসর' ও 'রবিবাসরীয়' শব্দটি ব্যবহারে থাকলেও অন্যান্য বারের ক্ষেত্রে 'বাসর' শব্দটি এখন প্রায় অপ্রচলিত।

গ্রহ, উপগ্রহ ছাড়াও বাংলা বারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা দেব-দেবীর পৌরাণিক কাহিনিও। সেসব অনুযায়ী রবির দেবতা আদিত্য, সোম-এর সঙ্গে জড়িত শিব, মঙ্গল হলো যুদ্ধের দেবতা এবং পৃথিবীর পুত্র। একই ভাবে বুধ হলো তার ও বৃহস্পতি বা চন্দ্রের সন্তান এক ঐশ্বরিক সত্তা। বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু আর শুক্র হলেন দানব বা অসুরদের গুরু। এক পৌরাণিক উগ্র দেবতা শনি হলেন সূর্য ও ছায়ার সন্তান।

এই বাংলা মাস ও বারের নামগুলির সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা নক্ষত্র এবং বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি। নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এইসব নামের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সাদৃশ্য রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল এবং উপাসনাপদ্ধতি অনুসারী দিনপঞ্জির সঙ্গে। আর এই ভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী মাস ও বারগুলিও সম্পৃক্ত রয়েছে বিশ্বভাবনার সঙ্গে। তাই এগুলি ভারতীয় হয়েও বিশ্বজনীনতারই এক প্রদীপ্ত প্রতীক।

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বঙ্গের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট মহারাজা শশাঙ্ক

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে যে কয়েকজন শাসক একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রথম স্বাধীন সম্রাট ছিলেন মহারাজা শশাঙ্ক। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি গৌড়কে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এবং উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বঙ্গকে একটি সার্বভৌম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জনপ্রিয় ঐতিহ্য ও বহু ইতিহাসচর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি করা হয় যে, শশাঙ্কই প্রথম 'বাংলা সন' বা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেন।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের পর উত্তর-ভারত ও বঙ্গভূমিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়। বঙ্গের পশ্চিম অংশে 'গৌড়' নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সময়ে কামরূপ, মগধ, মালব প্রভৃতি অঞ্চলও শক্তিশালী রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। উত্তর ভারতে পরে আবির্ভূত হন সম্রাট হর্ষবর্ধন। এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে শশাঙ্ক আবির্ভূত হন এবং বঙ্গকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করেন।

শশাঙ্কের প্রারম্ভিক জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য অল্প। ধারণা করা হয়, তিনি প্রথমে গৌড়ের কোনো সামন্তশাসক বা স্থানীয় অভিজাত ছিলেন। পরে স্বাধীন রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন (প্রায় ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি)।

তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার নিকটবর্তী)। সেখান থেকে তিনি সমগ্র গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও বিহারের কিছু অংশ শাসন করতেন। উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর

সংঘাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। হর্ষের সমসাময়িক সাহিত্য ও চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে শশাঙ্কের নাম উঠে এসেছে।

শশাঙ্কের কূটনৈতিক নীতি ছিল বাস্তববাদী। তিনি কখনও মৈত্রী, কখনও সংঘর্ষ— এই দুই পথেই নিজের ক্ষমতা রক্ষা করেন। ফলে বঙ্গ প্রথমবারের মতো উত্তর ভারতের ক্ষমতার ভারসাম্যে একটি প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে।

শশাঙ্ক ছিলেন শৈবসাধক। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপিতে শিবের প্রতীক দেখা যায়। তিনি শৈব ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বাঙ্গালি সমাজে একটি সুপ্রচলিত বিশ্বাস হলো শশাঙ্কই বঙ্গাব্দ (বাংলা সন) প্রবর্তন করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকেই বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। বঙ্গাব্দের সূচনা তাঁর রাজ্যাভিষেকের স্মারক।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করা হয়েছে, আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এই কথা সর্বৈব ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

শশাঙ্কের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য সীমিত হলেও তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে তিনি সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র। সামন্ত প্রথার মাধ্যমে অঞ্চল শাসন করা হতো। ভূমি রাজস্ব ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। তাঁর শাসনকালে বঙ্গ অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

শশাঙ্কের আগে বঙ্গ অনেকাংশে উত্তর ভারতের বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। কিন্তু তিনি বঙ্গকে স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তর ভারতের রাজনীতিতে সমমর্যাদায় অংশগ্রহণ করেন এবং একটি আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই কারণেই তাঁকে বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সম্রাট বলা হয়ে থাকে।

শশাঙ্কের মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদের তিনটি দিক বিবেচনা করতে হয় — (১) রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা,(২) ধর্মীয় পুনর্জাগরণ এবং (৩) বঙ্গাব্দের প্রবর্তন। তাঁর মৃত্যুর পর গৌড় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরে পালবংশ ক্ষমতায় আসে। তবু শশাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ঐতিহ্য বঙ্গের ইতিহাসে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

মহারাজা শশাঙ্ক কেবল একজন রাজা ছিলেন না; তিনি বঙ্গের রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের প্রথম নির্মাতা। তাঁর শাসন বঙ্গকে সুসংহত করেছিল, উত্তর ভারতের শক্তিধর সম্রাটদের সমকক্ষ করেছিল এবং একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ধারার সূচনা করেছিল। ইতিহাসের আলোচনায় তাই মহারাজা শশাঙ্ক কেবল অতীতের একটি নাম নয়; তিনি বাঙ্গালির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাচীন প্রতীক।

বাংলা পঞ্জিকার প্রতিটি নববর্ষে, বৈশাখের প্রতিটি সূর্যোদয়ে তাঁর স্মৃতি ইতিহাসের গর্ভ থেকে আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বঙ্গ একদিন নিজের শক্তিতে, নিজের বর্ষ গণনায়, নিজের সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। □

বঙ্গের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসকারী বামপন্থীদের চিরতরে নির্মূল করতে হবে

বামপন্থী নামের জীবাণুগুলি পশ্চিমবঙ্গে আজ অস্তিত্বহীন হয়েছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। শরীরের কোথাও কোথাও অল্প হলেও জীবিত রয়েছে। ওদের অস্তিত্ব চিরতরে শেষ না করলে বাঙ্গালি বাঁচবে না।

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

'নদীয়ার খেয়াঘাটে শ্রীচৈতন্য মুরগি কাটে / নিতাই ধরেছে তার ঠ্যাংরে এএএ....'। আশি-নব্বইয়ের দশকে স্কুলে-কলেজে পড়া, সদ্য গোঁফ গজানো উঠতি যুবকদের সুর করে গাওয়া এই ছড়াটির কথা কি আপনাদের মনে আছে? অথবা 'যার নাই মাই, তার নাম নিমাই' এই নোংরা ছন্দটি ? কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণদেব মৃগীরোগী ছিলেন। বিবেকানন্দ একজন ভণ্ড প্রতারক। চাকরি না পেয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তার স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাননি, কারণ তিনি অ-নারীবাদী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ভালো ছিল না, তিনি বুর্জোয়া কবি ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর কুকুর ছিলেন — এই কথাগুলি কারা বলতেন তাও কি আপনাদের জানা আছে? নিশ্চয়ই না। বঙ্গের প্রণম্য মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এমন কদর্য উক্তি কেউ করতে পারে একথা বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হচ্ছে ? কিন্তু ঠিক তাই হয়েছে। বিগত প্রায় পাঁচ দশক ধরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নামক একপ্রকার ঘৃণ্য জীবেরা এভাবেই বঙ্গের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মহাপুরুষদের অপমান করে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে যখন বামপন্থীদের রমরমা, তখন এবিটিএ নেতা, স্কুল শিক্ষক, পার্টি ক্যাডাররা আমাদের ঘরের কোমলমতি যুবক-যুবতীদের মনে এই বিষ ঢেলে ঢেলে রাজ্যের ভাবী প্রজন্মকে এভাবেই বঙ্গবিদ্বেষী তৈরি করে দিয়েছিল। একজন মানুষকেও এরা রাখেনি, যাকে বাঙ্গালি আইডোলাইজ করতে পারে। যাকে বাঙ্গালি আদর্শ মেনে 'তাঁর মতো হব, জ্ঞানে, সাহসে, তেজে, দেশপ্রেমে' একথা বলতে পারে। বাঙ্গালির মেরুদণ্ডটি বুঝি বরাবরের মতো ভেঙে দিয়েছে। বাঙ্গালি আজ এমন এক জাত যার ঈশ্বর নেই, হিরো নেই, আদর্শ নেই, বর্তমান নেই, তাই তার ভবিষ্যৎও নেই। এর একমাত্র কারণ এই কমিউনিস্টরা।

আশি-নব্বইয়ের দশক। বামপন্থীরা তখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। অনিল-শৈলেন-জ্যোতি-বুদ্ধবাবুদের রেজিম। স্কুলের সিলেবাস থেকে ধীরে ধীরে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-বিভূতি-শরৎচন্দ্রকে সরিয়ে তার জায়গায় সামনে আনা হচ্ছে বামপন্থী ননী ভৌমিক, সরোজ দত্ত, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, সুনীল গাঙ্গুলীদের মতো সাব স্ট্যান্ডার্ড সাহিত্যিকদের। এরাজ্যে এল কালচারাল মার্কসইজম। বাল্যকাল হতে শিশু-কিশোর মনে মার্কসবাদ ও সমাজবাদের প্রতি বিশ্বাস তৈরি করতে গল্প-নাটক-কবিতা-কাব্যে একটু একটু করে কমিউনিজমের বিষ ঢোকানো শুরু হলো। ন্যারেটিভ তৈরি করা হলো --- হিন্দু রীতি-সংস্কার, পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান এগুলি সব অন্ধবিশ্বাস ও প্রগতিবিরোধী। 'ধর্ম হল আফিং, আর তা শোষণের হাতিয়ার' --- মার্ক্সীয় তত্ত্বের চাষ শুরু হলো রাজ্য জুড়ে। শ্রীচৈতন্যদেবের বঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বঙ্গ, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের বঙ্গকে এরা ধীরে ধীরে মার্ক্স-লেনিন-স্তালিন-ক্রুশ্চেভ-মাওসেতুং- চে-গুয়েভারার বঙ্গে পরিণত করলো। বিগত প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ইনজেক্ট করা সেই বিষ আজও বাঙ্গালির ধমনীতে প্রবাহিত। তাই আজ বাঙ্গালির ধর্ম,সংস্কৃতি, ঐতিহ্য অপমানিত হলেও সে নিশ্চুপ থাকে, যেন তারা সব 'পি-পু-ফি-শু'-এর দলে।

বাঙ্গালিকে অপমান করার এই কাজটা শুরু করেছিলেন এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'কাকাবাবু' বলে পরিচিত মুজাফ্ফর আহমেদ। অবিভক্ত বঙ্গের নোয়াখালীতে জন্ম নেওয়া এই লোকটি ছিলেন আদ্যোপান্ত কমিউনাল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ছিল গীতাস্বরূপ। আর তাতে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দে মাতরম্' ছিল বীজমন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, মাস্টারদা থেকে নেতাজী সকলেরই প্রেরণার উৎসধারা ছিল এই গান। মুজাফ্ফর আহমেদ এই দেশভক্তির গানকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করলেন। তার লেখা 'আমার জীবন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' বইতে বঙ্গের দেশভক্ত বিপ্লবীদের সন্ত্রাসী বলে উল্লেখ করে লিখলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল মন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ গান। ....বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন ছিল হিন্দু উত্থানের আন্দোলন। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' (পৃষ্ঠা ২৮)।

সেদিন থেকে বামপন্থীরা দেশের মুক্তি সংগ্রামকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করেছে, তার থেকে দূরে থেকেছে। আজও তাদের সে মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। আজ 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ১৫০ তম বছরে ভারত সরকার যখন সারাদেশে বঙ্গের গর্ব 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পূর্ণ গানটি (ছ'টি স্তবক) সারাদেশের স্কুল-কলেজ সরকারি অনুষ্ঠানে গাওয়া আবশ্যিক বলে ঘোষণা করেছে, তখনই বঙ্গের বামপন্থীরা এর বিরোধিতায় মুখর হয়েছে।

বঙ্গের আর এক এলিট বুদ্ধিজীবী ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যার নাম শুনলে আজও বামপন্থীদের নাল-ঝোল পড়তে থাকে, তিনি জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেববাবুর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। বঙ্গের এই জগাই-মাধাই মিলে সুনীলবাবুকে রবীন্দ্রনাথেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন। এই সুনীলবাবু বঙ্গ-সংস্কৃতির কত বড়ো সর্বনাশ করেছিলেন তার দু' একটি উদাহরণ দিই। সালটা ২০০৬। দিল্লির কে কে বিড়লা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সুনীলবাবুকে সরস্বতী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এত বড়ো সম্মান বাঙ্গালি হিসেবে তো আমাদের গর্বই হওয়ার কথা তাই না? তবে গর্ব করার আগে বাঙ্গালির ঘরে পূজিতা, আমাদের ঘরের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর নামে এই সুনীলবাবু কী লিখেছিলেন তা আমাদের সকলের জানা উচিত। ২০০৫ সালের ২৮ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীলবাবুর 'বরপুত্র' রচনাটি পড়লেই আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন। অংশটি হুবহু তুলে ধরছি। আপনারাই বিচার করুন এই বামপন্থী কুলাঙ্গারটি সরস্বতী পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য কিনা?

'বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে টেনে চোখ মারি/ হে বীণাবাদিনী তুমিও তো নারী/ ক্ষমা করো এই বাক ব্যবহার...।' ক্ষমা করেছিলেন? এত বহু পরের ঘটনা। আগেরটা এবার সরস্বতী পূজার পূর্বলগ্ন। 'নিঃশব্দ নিবিড় রাত্রি, আমি বসে আছি, আমার সামনে একটি মাটির মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। .....একসময় সর্বাঙ্গে শিহরণ হলো। কী অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবসনা রমণীর। আয়ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠ, ভরাট বর্তুল দুটি স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত উরুদ্বয়।....তছনছ হয়ে যেতে থাকলো আমার কৈশোর, জেগে উঠলো পুরুষার্থ, অল্প অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল শরীর।.... চোরের মতন সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি হাত রাখলাম দেবী মূর্তির বুকে। 'জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচ যুগ শোভিত মুক্তাহারে....' সেই কুচ যুগে আমার আঙ্গুল, আমার শরীর আরো রোমাঞ্চিত হল, কান দুটিতে আগুনের আঁচ। আমি প্রতিমার ওষ্ঠ চুম্বন করলাম, আমার জীবনের প্রথম চুম্বন।'

এখানেই শেষ নয়। এই সুনীলবাবু তার আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস 'অর্ধেক জীবন' গ্রন্থে বাঙ্গালির আরাধ্যা দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভবতারিণী মা-কালীকে 'বীভৎস সাঁওতাল মাগি' বলে কদর্য ভাষায় উপহাস করেছেন। এতে তিনি যে শুধু মা কালীকেই অপমান করেছিলেন তা নয়, হিন্দু জনজাতি সাঁওতাল সমাজকেও চরম অসম্মান করেছেন। আবার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি উপন্যাসে তিনি লিখেছিলেন যে বাল্যকালে মা মারা যাওয়ার রাত্রে মাসির কাছে শুয়ে তিনি জীবনের প্রথম যৌন উত্তেজনা অনুভব করেছিলেন। এমনই মাতৃগামী নরপশু ছিলেন এই বামপন্থীটি। না, এখানেই শেষ নয়। বঙ্গের বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তাও বোধ হয় বেশিরভাগ বাঙ্গালি জানে না। ১৯০৯ সালে স্টার জলসা চ্যানেলের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি'র সঞ্চালক ঋতুপর্ণ ঘোষের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'ক্ষুদিরামকে যে পাঠানো হয় পিস্তল দিয়ে, তুমি যাও সাহেব মেরে এস, তার অন্যতম কারণ, এর বাবা মা নেই। গেল তো গেল। ধরা পড়লো তো মরলো। নেতারা তাই তাকে এ কাজে পাঠিয়েছিল।' ক্ষুদিরামের দেশভক্তি ও আত্মবলিদানকে এমন হীনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তার প্রেরণাতেই উদ্ভব হয়েছিল 'বার খেয়ে ক্ষুদিরাম' শব্দবন্ধটির।

বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি অপমানিত করেছে বাঙ্গালির অস্তিত্ব-সত্তা হিন্দুধর্মকে। বঙ্গের প্রধান পার্বণ দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসের ওই চার দিন বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে মা দুর্গা সপরিবারে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসেন। মা দুর্গা আমাদের কাছে কেবল ঘরের মেয়েই নয় 'মাতা নারায়ণী'। অচলা ভক্তিতেই বাঙ্গালির হৃদয়ে তার অধিষ্ঠান। সেই দুর্গাপূজাকে 'শারদোৎসব' নাম দিয়ে তার ভক্তিভাবকে অবলুপ্ত করতে চেয়েছে এই বামপন্থীরা। পূজা মানে কী? পূজা মানে ভক্তি, আরাধনা। তবে দুর্গাপূজা থেকে যদি পূজা শব্দটি সরিয়ে ফেলা যায় তবে বাঙ্গালি ভক্তিহীন হয়ে পড়বে। তাই ধর্মকে 'আফিং' বলা বামপন্থীরা নব্বইয়ের দশক থেকে পাড়ার দুর্গাপূজার কমিটিগুলোতে সভাপতি, সম্পাদকের দখল নিল। তার পর দেওয়ালে-ব্যানারে-পোস্টারে-প্রচারে দুর্গাপূজার জায়গায় ব্যবহার করতে শুরু করল 'শারদোৎসব' শব্দটি। এ এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। ঘরে ঘরে চাঁদা তুলে ভক্তিপূর্ণ মনে মা দুর্গাকে পূজা করার জায়গায় শুরু হলো সুজা- ম্যাকডোয়েলের স্পন্সরশিপে ঝা-চকচকে আলোর রোশনাই। অজস্র অর্থ জোগান। মায়ের পূজা হয়ে উঠল ভক্তিহীন-শ্রদ্ধাহীন- সংস্কারহীন, মৌজ-মস্তির কেন্দ্রবিন্দু। অসুরবিনাশী মায়ের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে শুরু হলো থিমের পূজা। অঞ্জলি শেষেই শুরু হয়ে গেল রান্নার মেনু নির্বাচন — মটন না চিকেন? সন্ধ্যা দশটার পরে বসলো শ্যাম্পেনের আসর। বিসর্জনের শোভাযাত্রার উপকরণ তালিকায় প্রথম ঠাঁই পেল পেটি পেটি মদ। তার সঙ্গে 'চোলি কা পিছে ক্যা হ্যায়' উদ্দাম নৃত্য।

এখানেই শেষ নয়। সরলমতি জনজাতিদের বিভ্রান্ত করতে এরা প্রচার করল 'হুদুর দুর্গা'র উপাখ্যান। তাদের শেখানো হলো হুদুর দুর্গা হলো চাইচম্পার এক পরাক্রমী রাজা। তাকে আর্যরা যুদ্ধে হারাতে না পেরে এক নারীকে ব্যবহার করেছিল। তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে, রূপ যৌবনে আকৃষ্ট করে, সঙ্গমের পর ছলনার দ্বারা হত্যা করেছিল। জনজাতিদের বোঝানো হলো এই হুদুর দুর্গা আসলে মহিষাসুর, আর দুর্গা ছিলেন সেই ছলনাময়ী নারী। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-

বাঁকুড়া- পশ্চিম মেদিনীপুরের জনজাতি এলাকায় এই গল্পের প্রধান প্রচারক বামপন্থীরাই। যে জনজাতিদের প্রধান উপাস্য দেবতা মারাংবুরু অর্থাৎ ভগবান শিব, সেই শিবপত্নী দেবী দুর্গাকে এমন হীন কদর্য ভাবে উপস্থাপনা করেছিল এরা। শুধু তাই নয়, যে বাঙ্গালির দুর্গাপূজা যা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকৃত 'অকালবোধন', বামপন্থীরা সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেও এই রাজ্যে বহিরাগত বলে আখ্যা দিয়েছে। এভাবেই বাঙ্গালিকে ভক্তিহীন ও অপমানিত করার কাজ বামপন্থীরা দশকের পর দশক ধরে করেছে।

দেশভাগের পর প্রমোদ-শৈলেন-জ্যোতিবাবু থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব-সুজন চক্রবর্তী পর্যন্ত, সকল বামপন্থী নেতা তাদের ধর্ম বাঁচাতে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড এই পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু ওপারে জেহাদিদের পায়ের লাথি খেয়ে, এপারে ডিগবাজি খেয়ে পড়ার পর গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিল। আজও চারআনা ছআনা দরের হাঁপানিতে ভোগা কমরেডরা ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদকে ব্যঙ্গ করে 'শ্যামাপোকা' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙে দশহাজার হিন্দু হত্যাকারী সুরাবর্দি ও মুজিবুর রহমানকে (যিনি বঙ্গবন্ধু নামে খ্যাত) যিনি রুখে দিয়েছিলেন, লাখো হিন্দুর প্রাণ যিনি বাঁচিয়েছিলেন সেই হিন্দু বীর গোপাল মুখার্জিকে ওই অকৃতজ্ঞরা সাম্প্রদায়িক বলে লেবেল সাঁটিয়ে দিয়েছে।

২০০০ সালে ফিল্ম ডিরেক্টর দীপা মেহেতা 'ওয়াটার' নামে একটা ফিল্ম বানাতে চেয়েছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল— বাঙ্গালি ঘরের মায়েরা যারা বিধবা হওয়ার পর বাকি জীবন কাশীতে কাটাতেন তারা নাকি সব সেখানে বেশ্যার জীবনযাপন করেন। মন্দিরের পুরোহিতের নাকি ভোগ্য সামগ্রী। সিনেমার সংলাপে হিন্দু দেবতাদের সম্বন্ধেও ছিল অশ্রাব্য কটূক্তি। স্বভাবতই সারা দেশে 'ওয়াটার'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কোনো সরকারই দীপা মেহেতাকে শুটিং করতে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু আমাদের কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু

কমরেড বিকাশরঞ্জন ও সুবোধ সরকার প্রকাশ্য রাজপথে বামপন্থী ভার্জিনিটির পরিচয় দিতে গোমাংস খেলেন। কিন্তু তারা একবারও মোহাম্মদ সেলিম বা ওই জাতীয় কাউকে পর্ক খাইয়ে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ নিতে পারেননি।

সেদিন হিন্দু বাঙ্গলিকে অপমান করতে দীপা মেহেতাকে দক্ষিণেশ্বরের অদূরে গঙ্গার তীরে শুটিং করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও হিন্দুদের চাপে শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বঙ্গের বিধবা মায়েদের প্রতি এই ছিল বামপন্থীদের শ্রদ্ধাবোধ।

তবে আজও বামপন্থীদের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আজও এরা মনে-প্রাণে বঙ্গ বিরোধী, হিন্দু বিরোধী। ক'মাস আগে মুর্শিদাবাদের মাটিতে ঘটে যাওয়া জেহাদি আক্রমণে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো বামপন্থী সমর্থক হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে। তখন এরা সকলে চুপ। অথচ ক'বছর আগে আনিস খানের মৃত্যুর প্রতিবাদে এরা কোচবিহার থেকে কলকাতা, ৫০ দিনের 'ইনসাফ যাত্রা' করেছিল। হিন্দু বাঙ্গালির হত্যায় এরা নীরব, কিন্তু মুসলমানের বেলায় প্রতিবাদ মুখর। আর আন্দোলনের নামকরণ দেখুন 'ইনসাফ যাত্রা', 'প্রতিবাদ যাত্রা' নয়। 'ইনসাফ' শব্দ বাংলায় কোন অভিধানে আছে ? একি বাংলা শব্দ ! বাংলা ভাষার আরবীকরণের কাজ এই বামপন্থীদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে যে আজ বাংলা ভাষার জায়গায় আরবি ভাষার ছড়াছড়ি, মা-বাবা, দিদি-বোন, কাকা- কাকি, মাসি-পিসি, জল, স্নান, নমস্কার, আপ্যায়ন, জলখাবারের পরিবর্তে চলছে আম্মা-আব্বা, আপা, খালা, চাচা-চাচি, পানি, গোসল, আদাব, দাওয়াত, নাস্তা শব্দের ব্যবহার, এ সবই বামপন্থীদের অবদান।

কমরেড বিকাশরঞ্জন ও সুবোধ সরকার প্রকাশ্য রাজপথে বামপন্থী ভার্জিনিটির পরিচয় দিতে গোমাংস খেলেন। কিন্তু তারা একবারও মোহাম্মদ সেলিম বা ওই জাতীয় কাউকে পর্ক খাইয়ে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ নিতে পারেননি। এরা কমরেড সুভাষ চক্রবর্তীকে তারাপীঠে পূজা দিতে গিয়ে 'জয় মা তারা' বলার অপরাধে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন, এরাই আবার মক্কায় গিয়ে হজ করে ফিরে এলে রেজ্জাক মোল্লাকে শুভেচ্ছা সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেয়। এর নামই বামপন্থা। ভাবতে অবাক লাগে এই ক্যানসারটিকে আমরা বাঙ্গালিরা ৩৫ বছর ধরে শরীরে পুষে রেখেছিলাম।

এই বামপন্থী নামের জীবাণুগুলি পশ্চিমবঙ্গে আজ অস্তিত্বহীন হয়েছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। শরীরের কোথাও কোথাও অল্প হলেও জীবিত রয়েছে। ওদের অস্তিত্ব চিরতরে শেষ না করলে বাঙ্গালি বাঁচবে না। এই পশ্চিমবঙ্গে আজ 'বন্দে মাতরম্' সাম্প্রদায়িক, লগ্নজিতার 'জাগো মা' সেকুলার গান নয়। মধুমন্তীর গাওয়া 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো' গান কমিউনাল। কবিগুরুর ছবি আগুনে পুড়ছে — এ সবই হলো ৩৫ বছরের বাম জামানার এক্সটেন্ডেড রূপ। আপনারা বলতে পারেন, তারা তো আজ শূন্য। না, তারা শাসনে-প্রশাসনে শূন্য হয়েছে ঠিকই কিন্তু চিরতরে মরেনি, সমাজে আত্মগোপন করে আছে। উপযুক্ত সময় ও সুযোগ পেলে আবার ফুটে বেরোবে। তাই বাঙ্গালির কর্তব্য আগামীদিনে বাঙ্গালির এই শত্রুটিকে এমনভাবে নির্মূল করতে হবে যাতে তারা আর কোনোও দিনও পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। □

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে নারীর অবদান

শক্তি, স্বদেশচেতনা ও নবযুগের অগ্রযাত্রা

ডঃ মৌমিতা বর

বঙ্গভূমিতে নারীজাতি কখনও কেবল ইতিহাসের অংশ নন, তাঁরা ইতিহাসের নির্মাতা । তাঁরা শক্তি, সৃষ্টির উৎস এবং অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীকে 'শক্তিরূপা' হিসেবে অভিহিত করা হয়; আর সেই চিরন্তন শক্তিরই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বঙ্গের শিল্প, অর্থনীতি ও সৃজনশীলতার প্রতিটি স্তরে। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা...' —এই বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সর্বভূ তে বিরাজমান সেই শক্তিই নারী। এই শক্তির ধারা ইতিহাসের গর্ভ থেকে আজকের আধুনিক ও ডিজিটাল যুগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা, অশিক্ষা, অবহেলা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বঙ্গের নারীরা কখনও উদ্যোক্তা, কখনও কারিগর, আবার কখনও পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছেন। তাঁদের হাতেই গড়ে উঠেছে শিল্পের নতুন দিগন্ত, তাঁদের চিন্তায় প্রসারিত হয়েছে অর্থনীতির পরিসর। যেখানে নারীর মর্যাদা রক্ষা হয়, সেখানেই সমৃদ্ধি, সৃজন ও কল্যাণের আবির্ভাব ঘটে। এই চিরন্তন সত্য বঙ্গের সমাজজীবন ও অর্থনীতির অন্তঃসলিলা স্রোতে গভীরভাবে প্রোথিত, আর শিল্পক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

বঙ্গের ইতিহাসে শিল্পোন্নয়নের ধারাটি কখনও একরৈখিক নয়; এটি সংগ্রাম, সৃজনশীলতা ও আত্মনির্ভরতার এক সম্মিলিত বহমান কাব্য। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে নারীরা কেবল সহযাত্রী নন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরাই নীরব স্থপতি, পথপ্রদর্শক ও প্রেরণার আলোকবর্তিকা। ঊনবিংশ শতকের কঠোর সামাজিক বিধিনিষেধ, শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য, কারুশিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন এবং স্বদেশি শিল্পের বিকাশে অনন্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের এই অবদান কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মধ্যে নিহিত রয়েছে আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতার চেতনা এবং আত্মনির্ভরতার দৃঢ় পদক্ষেপ। তাঁদের হাত ধরেই বঙ্গের শিল্প ও অর্থনীতি পেয়েছে শক্ত ভিত, আর সমাজ পেয়েছে এক নতুন দিশা যেখানে নারী কেবল অংশীদার নন, বরং অগ্রগতির অন্যতম প্রধান নির্মাতা।

ঊনবিংশ শতকের অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থায় যখন নারীর স্থান ছিল চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন রানি রাসমণি তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতা ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন নারীও বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সফল পরিচালিকা হতে পারেন। জমিদারি ও বাণিজ্য পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা সমাজের প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে নারীও বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সামলাতে সক্ষম। তাঁর জানবাজার এস্টেট পরিচালনা এবং গঙ্গা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কার্যক্রম তৎকালীন বঙ্গে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তা কেবল অর্থনৈতিক নয় , সামাজিক মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটায়। একই সময়ে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় চিকিৎসাক্ষেত্রে পথিকৃৎ হয়ে কর্মজীবী নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুক্ত করেন। তাঁদের সাফল্য নারীজাতিকে ঘরের বাইরে এসে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁদের এই সাহসী পদক্ষেপই ছিল ভবিষ্যতের শিল্পসমাজে নারীর অংশগ্রহণের প্রথম বীজরোপণ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবী শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বীণা দাসের মতো সাহসী নারীরা কেবল রাজনৈতিক লড়াইয়েই অংশ নেননি; তাঁরা আত্মমর্যাদা, দৃঢ়সংকল্প ও নির্ভীকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কম বয়সে তাঁদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, নারীশক্তি কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই।' তাঁদের জীবন যেন উচ্চারণ করে — 'ভয় নয়, সাহসই মুক্তির পথ। তাঁদের এই সাহসিকতা ও আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের নারীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনচেতনার বীজ বপন করে। ফলস্বরূপ, নারীরা ধীরে ধীরে গৃহের গণ্ডি অতিক্রম করে শিল্প, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় ভূ মিকা নিতে উদ্বুদ্ধ হন। এই মানসিক জাগরণই বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের এক দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে।

স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সমগ্র জাতিকে আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে। মাতৃভূ মিকে দেবীমূর্তিতে কল্পনা করার এই ভাবধারা নারীর শক্তির প্রতীক হিসেবেই প্রতিফলিত হয়। এই সময়ে নারীসমাজ দেশীয় বস্ত্র ও হস্তশিল্প উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং স্বদেশি শিল্পের পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে। এই ধারারই এক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদানকারী হলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী, যিনি নারীদের সংগঠিত করে স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার ও উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে নারী-উদ্যোগের ধারণা দৃঢ় ভিত্তি পায়।

রবীন্দ্র-চিন্তায় শিল্প কেবল অর্থনীতির উপাদান নয়—এটি মানবাত্মার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন শিল্পচর্চা বঙ্গের গ্রামীণ নারীদের সৃজনশীল শক্তিকে বিকশিত করার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রতিমা দেবী সূচিশিল্প, নকশা ও বস্ত্রকলায় নান্দনিকতার নতুন ভাষা নির্মাণ করেন। নকশিকাঁথার সূক্ষ্ম সেলাই, বালুচরির রঙিন বুনন কিংবা টেরাকোটার নিপুণ গড়নে আজও ধ্বনিত হয় বঙ্গনারীর নীরব সৃজনগাথা। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

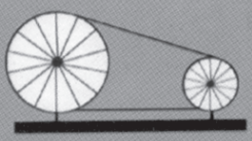

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

ভালোবাসাই নারীর সৃষ্টিশীল হাতে রূপ পায় শিল্পের অমর নিদর্শনে। নকশিকাঁথা, বালুচরী, ডোকরা ও টেরাকোটা শিল্পে নারীর সৃজনশীলতা আজ সমগ্র বিশ্ববাজারে সমাদৃত। সূঁচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে যে ইতিহাস লেখা হয়, তা আসলে বঙ্গের নারীশক্তির এক নীরব মহাকাব্য।

স্বাধীনতার পর বঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নারীরা আত্মনির্ভরতার এক সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠী আন্দোলন তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। লক্ষাধিক নারী আজ মশলা প্রক্রিয়াকরণ, দুগ্ধশিল্প, তাঁতশিল্প, মাটির পুতুল, টেরাকোটা ও ডোকরা শিল্পে যুক্ত। তাঁরা আজ উৎপাদক থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প— যেমন 'আনন্দধারা' ও 'উৎকর্ষ বাংলা'-র মতো প্রকল্প নারীদের দক্ষতা ও বিপণনের সুযোগ বাড়িয়েছে। ভারতীয় দর্শনের 'কর্মই পূজা'— এই ভাবধারা তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাস্তব রূপ লাভ করেছে। মনে পড়ে যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই অমর বাণী, 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং'— নিজের উন্নতি নিজেকেই করতে হবে।

সৃজনশীল শিল্প ও সাংস্কৃতিক অর্থনীতিতেও নারীরা নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। অপর্ণা সেন বাংলা চলচ্চিত্রে নারী-নির্দেশকের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলে প্রমাণ করেছেন— সৃজনশীল শিল্পও অর্থনৈতিক শক্তির উৎস। তাঁর পথ অনুসরণ করে নতুন প্রজন্মের পরিচালক, প্রযোজক ও কনটেন্ট-নির্মাতা নারীরা ওটিটি ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বঙ্গশিল্পকে তুলে ধরছেন। একইভাবে, ফ্যাশন ও হ্যান্ডলুম শিল্পে বহু নারী উদ্যোক্তা আজ ব্র্যান্ড নির্মাণ করছেন ; যা স্থানীয় তাঁতশিল্পকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিচ্ছে। কলকাতা ও সল্টলেকের আইটি হাবে বহু নারী সফটওয়্যার পেশাজীবী ও উদ্যোক্তা হিসেবে কর্মরত। স্টার্টআপ সংস্কৃতিতেও তাঁদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য; হস্তশিল্পের অনলাইন বিপণন, জৈবপণ্য উৎপাদন ও সামাজিক উদ্যোগে নারীরা নতুন কর্মসংস্থানের দ্বার খুলেছেন। এই প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক— 'একটি জাতির উন্নতি নির্ভর করে তার নারীদের অবস্থার উপর।' তাঁর 'উঠো, জাগো, এবং লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থেমো না'; এই আহ্বান আজও যুবসমাজের কাছে প্রেরণার উৎস। বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে নারীর এই ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা সেই আহ্বানেরই বাস্তব রূপ।

আধুনিক যুগে এই অগ্রযাত্রা আরও বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি, ই-কমার্স ও কর্পোরেট শিল্পেও নারীর অংশগ্রহণ আজ ক্রমবর্ধমান। HCL Technologies-এর চেয়ারপার্সন রোশনি নাদার মালহোত্রা ভারতের শীর্ষ প্রযুক্তি-নেত্রী হিসেবে কর্পোরেট দুনিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক। তিনি প্রমাণ করেছেন--- নারী বিশ্ববাজারেও সমান দক্ষ। সূচি মুখার্জির উদ্যোগ অসংখ্য ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল বাজারে যুক্ত করেছে। নন্দিতা সিনহা অনলাইন ফ্যাশন শিল্পে নেতৃত্ব দিয়ে নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। বন্দনা লুথরা সৌন্দর্য ও ওয়েলনেস শিল্পকে সংগঠিত রূপ দিয়ে নারীর উদ্যোক্তা-সক্ষমতার উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তাঁর মডেল অনুসরণ করে পূর্ব ভারতে বহু নারী বিউটি-ওয়েলনেস স্টার্টআপ শুরু করেছেন। এই সাফল্য কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি শিল্পক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্বের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন।

আজ শিল্পক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কেবল সংখ্যার বৃদ্ধি নয়; এটি এক নীরব বিপ্লবের প্রতিধ্বনি। কর্পোরেট বোর্ডে নারী-নির্দেশকের অন্তর্ভুক্তি, মাতৃত্বকালীন সুবিধার সম্প্রসারণ, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা, অধিকার ও সম্মানের স্বীকৃতি তাঁদের আত্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছে; আর প্রযুক্তির ডানায় ভর করে তাঁদের স্বপ্ন আজ সীমান্ত পেরিয়ে বিশ্বমঞ্চে উড়ে যাচ্ছে। বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে তাই নারীর এই নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রা সংগ্রাম থেকে সাফল্যের, অন্ধকার থেকে আলোর এক অনবদ্য কাব্য। আজ তাঁরা উৎপাদক, উদ্ভাবক, সংগঠক ও স্রষ্টা —সব ভূমিকাতেই সমান দীপ্ত। তাঁদের হাতেই বোনা হয় সম্ভাবনার বস্ত্র, তাঁর চিন্তাতেই রচিত হয় আগামীর শিল্পসভ্যতা। এই ইতিহাস আমাদের আহ্বান জানায় — উঠে দাঁড়াও, নিজেকে চিনে নাও, কারণ পরিবর্তনের শক্তি তোমার মধ্যেই নিহিত। এটি এক বৃহত্তর সামাজিক ও দার্শনিক চেতনারও প্রতিফলন — যেখানে ন্যায়, কর্তব্য ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মানবিক সমাজ।

নারী এখানে কেবল পরিবারের অঙ্গ নন; তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের কেন্দ্রবিন্দু। 'নারী-পুরুষের সমান অধিকার'— এই আদর্শ আজ কেবল স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তবের পথে অগ্রসরমান এক অঙ্গীকার। আর তাই নারী ও পুরুষের সম্মিলিত পদক্ষেপেই গড়ে উঠবে সেই সমাজ, যেখানে সমতা হবে শক্তি, আর সৃজনশীলতা হবে অগ্রগতির ভাষা। অতএব, বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে নারীর অবদান কোনো অতীতের গল্প নয়; এটি এক জাগ্রত শক্তি ; যা আজকে গড়ছে, আর আগামীকে আলোকিত করবে।

এই সমগ্র অগ্রযাত্রা ভারতীয় 'হিন্দুত্ব' দর্শনের মূল চেতনাকে প্রতিফলিত করে , যেখানে ধর্ম মানে ন্যায়, কর্তব্য ও সমন্বয়। নারী এখানে কেবল পরিবারের নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের কেন্দ্রবিন্দু। 'নারী-পুরুষের সমান অধিকার, এই হোক ভারতের অমৃত অঙ্গীকার।' আজকের যুবসমাজের কাছে এই ইতিহাস এক আলোকবর্তিকা। প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে দাঁড়িয়েও নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ রেখে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাওয়াই প্রকৃত উন্নয়ন। নারী-পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টাই পারে এক সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে। তাই নতুন প্রজন্মের কর্তব্য হলো নারীর সম্মান রক্ষা করা, তাঁদের উদ্যোগকে সমর্থন করা এবং দেশীয় শিল্পকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে নারীর অবদান কেবল সৃষ্টির পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, তা এক গভীর স্বদেশচেতনা ও আত্মমর্যাদার জাগরণ। তাঁদের সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনি নতুন প্রজন্মকে আত্মনির্ভর, সৃজনশীল ও দেশপ্রেমিক হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে। আজকের প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস এক মহৎ প্রেরণাস্বরূপ প্রতিবন্ধকতা যতই আসুক, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায় থাকলে সাফল্য অনিবার্য। এই অগ্রযাত্রায় নারী আজ শক্তির প্রতীক হয়ে, নবযুগের দিশারী হয়ে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করে চলেছে। আর বাংলার নারী সেই অদম্য শক্তির প্রতীক, যাঁদের শক্তি, প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতাই গড়ে তুলবে আত্মনির্ভর, সমৃদ্ধ ও সাংস্কৃতিকভাবে সুদৃঢ় এক নতুন ভারত। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

বঙ্গভূমির গৌরব-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে বাঙ্গালি অস্মিতা

ডাঃ মধুসূদন পাল

একসময় সমগ্র বঙ্গভূমির আয়তন অনেক বড় হলেও ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তর ও বঙ্গবিভাজনের পরে এর পরিসর অনেকটাই ছোটো হয়ে গিয়েছে। শ্রীশ্রীভগবানজীর ভাষায় বঙ্গভূমি অনেক বড়— 'পশ্চিমে গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা; হিমালয় থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে সমাপ্ত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবহমান। এই নদ তিব্বত হয়ে অসমের মধ্য দিয়ে ওপার বাঙ্গলায় প্রবেশ করেছে। এই দুই পবিত্র নদ-নদীর মধ্যবর্তী স্থলভাগটাই ছিল আদি বঙ্গভূমি।' এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ঘটেছে বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ। নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা অনুযায়ী, ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা অস্ট্রিক বা দ্রাবিড়, উত্তর-পশ্চিমের অধিবাসী ককেশিয়ান বা নর্ডিক জাতি এবং উত্তর-পূর্বের অধিবাসী মঙ্গোলয়েড জাতির পারস্পরিক মিলনের ফলে এই জাতিসমূহ-জাত সন্তানদের মধ্যে রয়েছে বহুবিধ গুণের সমাহার। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বয়ে আসা পলিমাটি গঠন করেছে এই ভূখণ্ডকে। তাই পলিমাটির মতোই এখানকার মানুষের মন নরম, মস্তিষ্ক উর্বর আবার কিছুটা ভঙ্গুরও। এই কারণে গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের পলিবিধৌত অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। তাঁরা প্রেমিক। তাই তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণবীয় সত্তার প্রাধান্য লক্ষণীয়। অন্যদিকে বঙ্গভূমির অধিবাসীরা জ্ঞানের উপাসক। তাই এরা শৈব। এঁরা আদি শক্তির উপাসক। তাই এঁরা শাক্ত। শ্রীশ্রীদুর্গা-কালী-তারা-জগদ্ধাত্রী-সরস্বতী-মহালক্ষ্মী- অন্নপূর্ণা— এঁদের উপাস্য। মনে রাখতে হবে, সাংখ্য দর্শনের জন্মও এই বঙ্গভূমিতেই। গঙ্গাসাগর সঙ্গমেই রয়েছে সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিলের আশ্রম। সবক'টি ধারা অনুসরণকারীদের মধ্যেই সমানভাবে রয়েছে ভারতীয় সনাতন হিন্দুধর্মের প্রবাহ। মত-পথ ও উপাসনা পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যেই এঁদের সৌন্দর্য-শক্তি ও সৃষ্টিশীলতা। ভগবান বুদ্ধের জন্মও এই ভূমিতেই। তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। এই ভূমিতেই অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়— 'নালন্দা'। বঙ্গসন্তান অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তিনি এখান থেকেই তিব্বত ও মহাচীনে যান ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডার প্রচারের জন্য। তাঁর অসাধারণ বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতো একাধিক চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পর্যটক ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন।

বর্তমানে সময়ের অর্থনীতিবিদরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্ববাণিজ্যে অবদানকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান প্রথম। এর মধ্যে আবার গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনা অঞ্চল এককভাবে প্রথম স্থানাধিকারী। অর্থাৎ একদা বঙ্গদেশের সমুদ্র অঞ্চল থেকেই শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বিভিন্ন বন্দরে রপ্তানি হয়েছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান খনন করে এটাই প্রমাণিত যে, খ্রিস্ট জন্মের বহু আগেই এই অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্র পথে মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, রোম ও মিশরের সংযোগ ছিল। আবার পূর্বদিকে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গেও বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল বঙ্গভূমির। এতদঞ্চল জুড়ে প্রাপ্ত অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করছে।

মধ্যযুগে ইসলামি তাণ্ডবলীলায় এই বঙ্গভূমির অনেক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তার ফলে অনেক কিছুই হয় বিকৃত। এই বঙ্গভূমির বিপুল ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি এখানে এসেছে। সব শেষে এসেছে ব্রিটিশ। ছল-চাতুরির দ্বারা ইংরেজের বঙ্গবিজয় ও অযোধ্যাবিজয়ের সাক্ষী থেকেছে ইতিহাস। দিল্লি দখল করে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করে ইংরেজরা। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছে আরও অবক্ষয়। ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গপ্রদেশে বৃদ্ধি পায় গান্ধীবাদের প্রভাব। শৈব ও শাক্ত হওয়া সত্ত্বেও গোটা দেশের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে না পেরে বঙ্গভূমিও হয় গান্ধীবাদের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত। এরপর অব্যাহত থাকে তার সত্তার ক্রমাগত অবক্ষয়। বাঙ্গালিসত্তা ও চরিত্রের অবক্ষয় হয় ক্রমবর্ধমান। পরবর্তী বিষক্রিয়া হলো--- বাঙ্গলার মানুষের চিন্তা-চেতনায় মার্ক্সবাদের অনুপ্রবেশ। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বাঙ্গালি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ না করেই মার্ক্সবাদের সুরা পান করল। সেই বিষক্রিয়ায় ধ্বংস হলো তার সমস্ত বিচার, বুদ্ধি। গান্ধীবাদের বিষে আক্রান্ত এবং মার্ক্সবাদে মাদকাসক্ত হওয়ার পর এই মুহূর্তে এপার-ওপার— দুই বঙ্গের বাঙ্গালির সংকট তিন ধরনের। (১) ওপার বঙ্গের সংকট— 'বাঙ্গালি' হয়ে বাঁচা, অথবা 'মজহব' নিয়ে বাঁচা। (২) এপার বঙ্গের বাঙ্গালির সংকট হলো— সমগ্র ভারতীয় সত্তার একটা অংশ হিসেবে এ রাজ্যের বুকে সনাতন আদর্শ নিয়ে বাঁচা, অথবা সেকুলার হয়ে যাওয়া। যদিও 'সেকুলার' শব্দের অর্থ তাদের বেশিরভাগের অজানা। (৩) তৃতীয় সংকট— তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার অভাব এবং পাশ্চাত্য চিন্তার অন্ধ অনুসরণ। নিজস্ব শিকড় অনুসন্ধান করে স্বকীয় চিন্তাধারার অধিকারী না হলে অবক্ষয়ের অতলে বাঙ্গালিজাতির তলিয়ে যাওয়া অব্যাহত থাকবে। □

With Best Wishes :-

Radha Electricals

Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex

Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur

Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

EPC Electrical Private Limited.

71A, Tollygunge Road, Kolkata - 700 033

Phone :- 24241240/ 7108, M: - 9748571413

E-mail : epc@epcfans.com

Website : www.epcfan.in

Manufacturer of

Heavy Duty Exhaust Fans, Air Circulator, Mancooler, Axial Flow Fan, Motor

WE HAVE DEALERS ALL OVER INDIA

বঙ্গের প্রথম সার্বভৌম নৃপতি
মহারাজা শশাঙ্ক

অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী

পূর্ব ভারতে মহারাজা শশাঙ্কের অভ্যুদয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুদ্রা, লিপি, বিদেশি পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং সমসাময়িক সাহিত্য গ্রন্থ থেকে শশাঙ্কের জীবন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যায়। সমসাময়িক সূত্রগুলিতে তিনি সোমদত্ত নামেও উল্লিখিত হয়েছেন। বাঙ্গালি ঐতিহাসিকরা শশাঙ্ককে বাঙ্গালি বলে অভিহিত করতে পছন্দ করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্ককে 'বাঙ্গালি রাজা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শশাঙ্ক মূলত ওড়িশার অধিবাসী ছিলেন। তবে তিনি বঙ্গের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন এবং এই বিজয়ের পর বঙ্গেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

ইতিহাসে শশাঙ্কের প্রথম পরিচয় মহাসামন্তরূপে। তবে তিনি কার মহাসামন্ত ছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতো অনেক ইতিহাসবিদ্ মনে করেন, মহাসেন গুপ্ত বা তৎপরবর্তী মালবাধিপতি দেবগুপ্ত তাঁর অধিরাজ ছিলেন। রাজ্যবর্ধন কর্তৃক দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্ক দেবগুপ্তের দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অর্থাৎ মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রীবন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এই সব কারণে অনুমান করা হয় শশাঙ্ক মগধ-মালবাধিপতি গুপ্তরাজাদের মহাসামন্ত ছিলেন। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ৬০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে আগে কোনো সময়ে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন

নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

উৎকল ও দণ্ডভুক্তির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার পর মহারাজ শশাঙ্ক আরও উত্তরদিকে রাজ্য সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। কালক্রমে তিনি বর্ধমানভুক্তি ও উদম্বরিকবিষয় জয় করলেন। সম্ভবত এই বিজয়ের পর তিনি রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। কর্ণসুবর্ণ পূর্ববর্তী শাসক জয়নাগেরও রাজধানী ছিল। জয়নাগের শাসনের অবসানের অল্পকালের মধ্যেই ওই অঞ্চলে শশাঙ্কের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট মহারাজা শশাঙ্ককে গৌড়াধিপতি বলে উল্লেখ করেছেন। আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প অনুসারে পুণ্ড্রনগর শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। শশাঙ্ক গঙ্গানদী অতিক্রম করে বরেন্দ্রের একটি বিস্তৃত অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিরাট অংশে তিনি প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন, তাই তাঁকে গৌড়াধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দক্ষিণ বিহারের রোটাসগড়ে শশাঙ্কের নামাঙ্কিত একটি সিলমোহরযুক্ত লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিতে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য' এই কথা কয়টি উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হয় যে, ওই অঞ্চল তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। এই সব তথ্য প্রমাণ থেকে সহজেই বলা যায় যে, উত্তরে মালদহ থেকে দক্ষিণে গঞ্জাম ও পূর্বে ভাগীরথী করতোয়ার তীর থেকে পশ্চিমে শোন নদের তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে শশাঙ্কের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল।

শশাঙ্কের নামাঙ্কিত মুদ্রাসমূহ উত্তর ওড়িশা, গঙ্গাসাগরের তীববর্তী অঞ্চলে এবং ভাগীরথীর মোহনা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠে শিব ও বৃষের মূর্তি অঙ্কিত আছে। অপর পৃষ্ঠে 'গজলক্ষ্মীমূর্তি ও শ্রীশশাঙ্ক' এই কথাটি খোদিত আছে। মুদ্রাগুলি গুপ্তযুগের মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত।

মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী একাধিকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে দুইটি তাম্রলিপি তবীর নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। সম্ভবত তবীর দণ্ডভুক্তির শাসনকেন্দ্র ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতে রক্তমৃত্তিকা নামক বৌদ্ধ বিহারের নিকট অবস্থিত কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। রক্তমৃত্তিকা বর্তমানে রাঙ্গামাটি নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে রাঙামাটি অবস্থিত। সম্প্রতি খনন কার্যের ফলে রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

রোটাসগড় পর্যন্ত ভূভাগে প্রভুত্ব

With Best Compliments From :

Wadhwana

24, Park Street,
DEVELOPMENT HOUSE
3rd. Floor
Kolkata - 700016
Phone :9830023763, 9874949489
e-mail :
wadhwana24@hotmail.com

With Best Compliments From :

LEADSTONE INTERNATIONAL LLP.

19, R. N. Mukherjee Road,
1st Floor, Kolkata 700 001
Ph. +91 33 2248 1789/ 1790
Email : leadstone.intl@gmail.com

With Best Wishes :-

NAVSHAKTI CLEARING

&

CREDIT PVT. LTD.

Exclusive Stockinsts of Ultratech Cement

INDENTING AGENTS OF :-

RASHMI CEMENT LTD.

"Home Land"
18B, Ashutosh Mukherjee Road, 5th Floor, Room No. 504, Kolkata - 700 020
Tele/Fax : 2486 3672, Mobile - 98301 05905
Email : pandya.navshakti@gmail.com pandya.trendsetters@gmail.com

স্থাপন করবার পর শশাঙ্ক স্বাভাবিক ভাবেই মগধ বা দক্ষিণ বিহার জয় করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এমনকী এই উদ্দেশ্যসাধনে তিনি বুদ্ধগয়াতেও অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সেই সময়ে মগধ বা দক্ষিণবিহার কনৌজ সম্রাটের রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং মগধের উপর আধিপত্য নিয়ে শশাঙ্ক ও কনৌজ সম্রাট গ্রহবর্মণের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক এবং মালবরাজ দেবগুপ্ত উভয়েই কনৌজের আধিপত্য সংকোচনে অভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সেযুগে উত্তর ভারতে কনৌজ রাজ্য এবং রাজধানী মহোদয়শ্রী সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। শশাঙ্ক ও দেবগুপ্ত উভয়ে একটি মৈত্রীজোট গঠন করেন এবং কনৌজের রাজা গ্রহবর্মণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এক যুদ্ধে গ্রহবর্মণ নিহত হন এবং রানি রাজ্যশ্রী কনৌজ থেকে পলায়ন করেন।

রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগ্নী। রাজ্যবর্ধন দ্রুত অগ্রসর হয়ে শত্রুসৈন্যদের বিতাড়িত করেন এবং কনৌজের সিংহাসন অধিকার করলেন। অতঃপর কালবিলম্ব না করে তিনি কামরূপ এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। সম্ভবত মহারাজ শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে সফলকাম হতে পারবেন না মনে করে রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজ্যবর্ধন এই সন্ধিতে সম্মত হন। একটি নির্ধারিত স্থানে এই সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সামান্য আগে রাজ্যবর্ধন আততায়ীর হাতে নিহত হন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের বর্ণনা অনুসারে, 'গৌড়ের মিথ্যা উপাচারে আশ্বস্ত হয়ে নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাকী গৌড়ের রাজভবনে গমন করেন। সম্ভবত পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী গৌড়রাজের ইঙ্গিতে সেখানে তিনি নিহত হন।'

বাণভট্টের মতে রাজ্যবর্ধনের হত্যার সংবাদ শুনে হর্ষবর্ধন শপথ করেছিলেন যে যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী গৌড়শূন্য করতে না পারেন তবে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। অতঃপর বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি গৌড়রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য হর্ষবর্ধনকে যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে বিন্ধ্য পর্বতের দিকে যাত্রা করতে হলে তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

হর্ষবর্ধন ও রাজা ভাস্করবর্মণের মধ্যে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। মৈত্রীচুক্তি অনুসারে মহারাজ ভাস্করবর্মণ তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে বঙ্গে প্রবেশ করলেন। ইতিপূর্বে সম্রাট হর্ষবর্ধন মালববাহিনীকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের সেনাবাহিনীর কিছু অংশ ভাস্করবর্মণের সঙ্গে যোগ দিলে মিত্রবাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভাস্করবর্মণের সঙ্গে শশাঙ্কের কোন স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল সেই তথ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত শশাঙ্কের যে সমগ্র গৌড়দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং উৎকল ও কঙ্গোদ দেশের অধিপতি ছিলেন, তার প্রমাণ বিদ্যমান।

কঙ্গোদে শৈলোদ্ভববংশীয় অধিপতি মহারাজ মহাসামন্ত দ্বিতীয় শ্রীমাধবরাজের (৬১৯ খ্রিঃ) একটি লিপিতে মাধবরাজ শশাঙ্ককে তাঁর অধিরাজ বলে উল্লেখ করেছিলেন। সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত ও মহাপ্রতিহার শুভকীর্তির অধুনাবিষ্কৃত মেদিনীপুর (প্রাচীন নাম মিধুনপুর) লিপি দুটিতেও শশাঙ্ক অধিরাজ বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই লিপি দুটির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, দণ্ডভুক্তিদেশ শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উৎকলদেশ দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ছিল। ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়ে থাকবে, কারণ ওই সময়ে হিউয়েন সাঙ (য়ুয়ান-চোয়াঙ) মগধ ভ্রমণে এসে শুনলেন কিছুদিন আগেই শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কেটে ফেলেছেন এবং স্থানীয় বুদ্ধমূর্তিটি নিকটেই একটি মন্দিরে সরিয়ে রেখেছেন; এই পাপের ফলেই নাকি শশাঙ্ক কুষ্ঠজাতীয় কোনো ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে অল্পদিনের মধ্যে মারা যান। মঞ্জুরীমূলকল্প গ্রন্থেও এই গল্পের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়; তবে গল্পটি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা বলা কঠিন, কারণ বক্তাদের উভয়েই ছিলেন মহারাজ হর্ষবর্ধনের অনুগৃহীত। শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলার কোনো কারণ নেই। হিউয়েন সাঙ গৌড় ভ্রমণকালে অনেক বৌদ্ধমঠ ও বিহার দেখেছেন যেগুলি রাজকীয় অর্থানুকূল্যে চলত।

শশাঙ্ক কীর্তিমান নরপতি ছিলেন সন্দেহ নেই। তিনিই বঙ্গের জাতীয় বীর, বাঙ্গালির জাতীয় নায়ক। এক অজ্ঞাতকুলশীল মহাসামন্তরূপে জীবন শুরু করে, তদানীন্তন উত্তর ভারতের সর্বোত্তম শক্তিশালী রাজ্যগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ-স্থানীশ্বর-কামরূপ মৈত্রী) বিরুদ্ধে সার্বিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শেষপর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, এই তথ্যই ঐতিহাসিকদের প্রশংসিত বিস্ময়ের উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট। বাণভট্ট হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্পর্কে যে গল্প তৈরি করেছেন তা নিশ্চিত পক্ষপাতদুষ্ট।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৬৯)

বিপরীত পরিবেশ
অনুকূল বার্তা

১৯৩২ সালে ১৫ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ প্রশাসন ঘোষণা করেছিল, কোনো সরকারি কর্মচারী সঙ্ঘকার্যে বা শাখায় যোগদান করতে পারবেন না, কারণ সেটি নাকি একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। পেশীশক্তি কোনোদিন সত্য বা যুক্তির ধার ধারে না। এখানেও তাই হলো। দেখা গেল এই আদেশ সঙ্ঘের উপরে সমস্যা হলেও বিরাট কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো না। ঠিক এক বছর পরে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার আরও একটি ঘোষণাপত্র জারি করলো। তাতে বলা হলো স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের পক্ষেও সঙ্ঘে অংশগ্রহণ অবাঞ্ছনীয় বলে পরিগণিত হবে।

এটা সবার মধ্যে এক প্রশ্ন ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করল। কারণ এই সমস্ত সংস্থার সকলেই সঙ্ঘের সমর্থক ছিলেন না। তাছাড়া তাঁরা নিজেরা নিজেদের পছন্দ মতো অনেক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ছোটো ছোটো সংস্থার প্রতিও বিদেশি শাসকের এহেন খবরদারি কারও পছন্দ ছিল না। ডাক্তারজী এই অসন্তোষের পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে সঙ্ঘকে সকলের কাছে তুলে ধরার যোজনা তৈরি করলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করে তাদের সামনে সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করে তোলেন এবং সঙ্ঘ যে একটি অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক সংগঠন একথা প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়াও নানা স্তরের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে নিরন্তর সম্পর্ক করেন তিনি।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে 'অখিল মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মেলন'-এর একটি অধিবেশন হয়। সে সময়ে সেখানে সঙ্ঘের শিবিরও চলছিল। ডাক্তারজী চাইছিলেন এই সুযোগে অধিবেশনে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ সঙ্ঘ দর্শন হোক। নিজেদের তৈরি সুসজ্জিত তাঁবুতে আবাস ব্যবস্থা, অনুশাসনবদ্ধ হাজার স্বয়ংসেবকের দিনচর্যা, কর্মসূচি, সর্বোপরি ঘোষবাদ্য-সহ পথ সঞ্চলন সকলে পরিদর্শন করুন। সে মতোই ব্যবস্থা হলো। লোকমান্য তিলকের এক সময়কার সহযোগী 'নবকাল' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণজী পন্ত শ্রীদত্তোপন্ত পোতদার, বা স জোশী, য ব দেশপাণ্ডে, বাবুরাও গোখলে, শঙ্কররাও দেব, সরদার কিরে সাহির ও খাদিল কর একসঙ্গে সকলে শিবির পরিদর্শন করতে এলেন। শিবিরের পরিবেশ সকলের উপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করল। শ্রীকাকা সাহেব খাদিল কর পথসঞ্চলন দেখে তখনই বলে ওঠেন— 'এই প্রসঙ্গের বর্ণনা করা কঠিন। প্রত্যক্ষ দর্শনেই এর প্রকৃত বর্ণনা'। স্বয়ংসেবকদের সামনে ভাষণে তিনি ডাক্তারজীর সংগঠন কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন— ''আমরা সাহিত্যিক মানুষেরা তো বাক্যবীর কিন্তু এখানে শক্তির প্রত্যক্ষ উপাসনা চলছে। এ হলো শক্তির দৃশ্য স্বরূপ। শত সহস্র ব্যাখ্যা দিয়ে এবং প্রবন্ধ লিখে আমরা যে কাজ সিদ্ধ করতে পারি না, যে ভাবনা মানুষের মনে অঙ্কিত করতে পারি না, তা সঙ্ঘের এই দৃশ্য দর্শনের মাধ্যমে সম্ভবপর। প্রত্যক্ষ দৃশ্য স্বরূপের দ্বারাই মহান তত্ত্বসমূহের বোধ হতে পারে সঙ্ঘ তার অত্যন্ত প্রভাবী উদাহরণ।''

খাদিল করজীর ভাষণ এক সময় শেষ হলো। কিন্তু ডাক্তারজীর সফলতার প্রতিরূপ সঙ্ঘ এগিয়ে চলল তার লক্ষ্য পথে দূর থেকে আরও দূরের পথে। □

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Manufacturers of Wire and Wire Products

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

With Best Compliments From -

সঙ্ঘের শতবর্ষে শুভকামনা

A

WELL WISHER

(A.B.)

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

With Best Compliments From :-

Rajesh Kankaria